# বাংলাভাগের বলি

## মণীন্দ্র নাথ সমদ্দার

সাধারণ সম্পাদক
সারা ভারত উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

# বাংলাভাগের বলি

মণীন্দ্র নাথ সমদ্দার

সাধারণ সম্পাদক
সারা ভারত উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

প্রকাশক: ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রকাশ কাল: প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০১১

কপিরাইট: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

অক্ষর বিন্যাস:
জয়ন্ত মিত্র
দূরভাষ: ৯৫৬৪০০০১৩৭

মুদ্রক:
শোভা প্রিন্টার্স
রাজা মার্কেট, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

প্রাপ্তিস্থান:
সুবেন চন্দ্র বিশ্বাস (এড্‌ভোকেট), বারাসাত কোর্ট
হৃদয়পুর, উত্তর ২৪ পরগনা
ফোন: ৯৪৩৩৮৮৯৫৭

শিমূল হালদার
শোভা বুক এন্ড ভ্যারাইটি স্টোর্স
ক্ষুদিরাম মার্কেট, গুমা, উত্তর ২৪ পরগনা

পৃষ্ঠপোষকতা:
সুবোধ চন্দ্র সমাদ্দার
ঠাকুরপুকুর, ফোন: ০৩৩-২৪৯৭ ২৬২৪

সহযোগিতা: সুকুমার চন্দ্র সিকদার, মছলন্দপুর

বিনিময়: ১৫ টাকা

# মুখবন্ধ

পাশ্চাত্য শাস্ত্রে ইতিহাসকে বলা হয় পঞ্চম বেদ। তাই ইতিহাসের ইতিহাস সঠিক হওয়াই উচিত। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাকালে অনেক প্রশ্ন জাগে— জাগে অনেক জিজ্ঞাসা। এ ছাড়া অনেক 'কিন্তু' অনেক 'যদি' এবং বহু 'কেন'র সম্মুখীন হতে হয়। সেই খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে শুরু করে ধর্মীয় বিদ্বেষের হানাহানি, সামাজিক বিভেদের রেষারেষি, রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রতিযোগিতা, নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই, জাতিতে জাতিতে প্রতিহিংসা আজও ভারতের মাটি থেকে বিলুপ্ত হয়নি। সেই বৈদিক যুগে ধর্মীয় কারণে ভারতবর্ষে আর্য-অনার্যের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সনে সেই ধর্মীয় বিভেদের কাছেই পরাজিত হয়ে ভারতবাসী ভারতবর্ষকে তিনভাগে ভাগ করে দিতে বাধ্য হল। তাই ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিমের মানচিত্রের দিকে তাকালে তার আঁকা-বাঁকা চিহ্ন সমগ্র বিশ্বকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, 'ওই একটা সামাজিক ও ধর্মীয় বিভেদের দেশ'। সেই থেকে সাম্প্রদায়িক বিভেদের কালো ছায়া আজও দেশ থেকে মুছে যায়নি— মুছে যায়নি দেশ বিভাগের যন্ত্রণা। স্বাধীন ভারতের বয়স প্রায় ৬৫ বছর। অথচ বিভাজনের কারণে দুই বাংলায় কয়েক কোটি মানুষ স্বাধীনতার সুখ থেকে আজও বঞ্চিত। এই বঞ্চনার জন্য কখনও উদ্বাস্তু ছুটে আসে, কখনও শরণার্থী আছড়ে পড়ে। ও পার বাংলায় নিরাপত্তা নেই বলেই এপারে আশ্রয়ের জন্য তারা ছুটে আসে। কিন্তু এপারে এসে নিরাপত্তা, আশ্রয় এবং অধিকার কিনতেই [illegible] হয়। তাই বাংলা ভাগের

বলি হওয়া কয়েক কোটি মানুষের আজও আকাশ ফাটা আর্তনাদ। তাদের দেশ নেই, জাতীয়তা নেই, বেঁচে থাকার অধিকার নেই, সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত। রাজনৈতিক দলগুলি খুব পরিকল্পিতভাবেই একটা সম্প্রদায়কে আধুনিক সভ্যতা থেকে আদিম সভ্যতায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি আন্দোলন করতে গিয়ে হেরে গিয়েছি। তবুও বিবেক যেন বারে বারে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তাই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমগ্র বাঙালী জাতিকে সচেতন করার জন্য শেষে লেখনী ধরেছি।

স্বাধীনতার বলিপ্রাপ্ত একই মানুষেরা দুই বাংলায় দুটি স্বাধীনতার পরেও কীভাবে ৬৪ বছর ধরে দুই রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে তা পরস্পর এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে। তাই বইয়ের নাম রাখা হয়েছে 'বাংলা ভাগের বলি'। এছাড়া ব্যর্থতার কারণ সহ সমাধানের দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

এই অমানবিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি কখনও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, যদি কোনও মহান বিপ্লবী নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন, যদি দেশ ভাগের যন্ত্রণা থেকে এই হতভাগ্য মানুষের মুক্তি হয়, তবেই রাত জেগে জেগে আমার লেখা সার্থক হবে— সার্থক হবে প্রতিবাদী স্বপ্ন। এই বই প্রকাশের জন্য শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদার, শ্রী সুবোধ চন্দ্র সমদ্দার এবং 'দেশ ভাগের যন্ত্রণা' বইয়ের প্রকাশক শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস মহাশয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই বই 'মা' ও 'মাতৃভূমি'র নামে উৎসর্গ করলাম।

নববারাকপুর মনীন্দ্র নাথ সমদ্দার
১৫ আগস্ট ২০১১

# প্রকাশকের কথা

আমি পূর্ব বাংলা থেকে আগত একজন উদ্বাস্তু। ওপার বাংলায় বাড়ি ছিল বরিশাল জেলায় স্বরূপকাঠি থানার অন্তর্গত জিন্দাকাঠি গ্রাম। বর্তমানে এপার বাংলায় উঃ ২৪ পরগণা জেলার নববারাকপুরের বাসিন্দা। পেশায় ভারত সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। অবসর সময় গরীব মানুষকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে সেবা করার চেষ্টা করি। বহুদিন ধরে রেল লাইনের গায়ে উদ্বাস্তুদের অবস্থা দেখে আমার মনে হয়েছে উদ্বাস্তু সংক্রান্ত এই গুরুতর সমস্যাটি নিয়ে সরকার আজও সেভাবে চিন্তা করছে না। দেশ ভাগের বলি হয়ে প্রায় ২ কোটি উদ্বাস্তু ভারতে এসে নাগরিকত্ব হীনতায় মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাই; ওপার বাংলার সংখ্যালঘুদের বিপদ সঙ্কুল জীবন যাত্রা এবং এপারে আসা উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার জন্য আমি শ্রী মনীন্দ্রনাথ মজুমদারকে কিছু লিখে প্রকাশ করতে অনুরোধ করি। তাই তিনি ৪ মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে দুই বাংলার বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং এই পুস্তিকাখানি রচনা করেন। আমার মনে হয় উদ্বাস্তু সমস্যা শুধু উদ্বাস্তুদের নয়; এটি একটি জাতীয় সমস্যা এবং লেখক সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। পরোক্ষভাবে লেখক সমস্ত উদ্বাস্তু সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করার আহ্বান জানিয়েছেন। এই পুস্তিকায় উদ্বাস্তু আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ প্রকাশ করেছেন, পাশাপাশি সমাধান সূত্রটি তুলে ধরেছেন। এই বইয়ে চিত্রের সাথে বিষয়বস্তুর এবং বিষয়বস্তুর সাথে নামের অপূর্ব মিল। আমার একান্ত বিশ্বাস, এই পুস্তকখানি পাঠ করলে, পাঠক দুই বাংলার দেশ ভাগের বলি প্রাপ্ত মানুষের সমস্যা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবেন এবং সমাধানের সঠিক পথ বেছে নিতে পারবেন। যদি তাই হয়, তবে এ লেখা সার্থক হবে।

নববারাকপুর
১ জুলাই ২০১১

ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

# সূচীপত্র

## এক

## বাংলা ভাগের প্রকৃত স্বরূপ

স্বাধীন ভারতের জন্ম এবং তার অবয়ব সবই হয়েছে ধর্মীয় দেশ ভাগের বিক্রিয়ার নক্সা অনুসারে এবং এই ভুল বিক্রিয়ার ফলে এই উপমহাদেশে 'উদ্বাস্তু' নামে চির রুগ্ন বহু সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। তাই একথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য যে, ভারতবর্ষের মানুষ স্বাধীনতার পূর্বে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছে, তারপর মূল ভূখন্ড তিন ভাগ হয়েছে, এরপর বৃটিশ শাসক দুই দেশের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে, যার নাম 'স্বাধীনতা' — অর্থাৎ ধর্মকে আগে রাখা হয়েছে এবং ধর্মের নামে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে "দেশভাগের বলি" করে দেশ স্বাধীন হয়েছে তখন ১.২০ কোটি মানুষকে উদ্বাস্তু হওয়া ধার্য হল অথচ তাদের জীবন জীবিকা বা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হল না। পাঞ্জাবীরা ক্ষমতার জোরে তাদের প্রাপ্য তারা আদায় করে নিল — আর বাঙালিরা শুধু নেতাদের প্রতিশ্রুতির উপর আশা ভরসা করে বসে রইল। এখন নেতাদের কাছে সেই প্রতিশ্রুতিগুলি পদদলিত কাগজ মাত্র। এই জন্যই আজ বাংলায় অনুপ্রবেশের - এত-জ্বালা, উদ্বাস্তুদের এত দুর্দশা।

### বাংলাভাগের গোজামিল

দেশ ভাগের বিশেষত্ব এবং তার রহস্য ছিল ভিন্নরূপ। স্বাধীনতার সময় ভারতবর্ষে প্রধানতঃ বাংলা, আসাম এবং পাঞ্জাব ভাগ হয়েছিল। স্বাধীনতার ২ বছরের মধ্যে পাঞ্জাবের মাটি, মানুষ ও সম্পদ সবই ভাগ হয়ে গেল, তাদের পুনর্বাসন হয়ে গেল এবং তারা নাগরিক অধিকারও পেয়ে গেল। অপরদিকে বাংলার মাটিও ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হল, কিন্তু তার মানুষ ভাগ হল না, অর্থাৎ স্বাধীনতার নামে যাদের বলি দেওয়া হল তাদের স্থায়ী আবাসভূমি স্থির করা হল না। স্বাধীনতার পরেই পূর্ব পাকিস্থানে সংখ্যা লঘু বিতাড়ন শুরু হল, তখনও লোক বিনিময়ের চেষ্টা করা হল না, শুধু আশ্রয়ের জন্য অফুরন্ত প্রতিশ্রুতি। তখন সমগ্র বাংলার মোট আয়তন ছিল ২,৩১,৮৪৮ বঃ কিঃ মিঃ এবং মোট লোক সংখ্যা ছিল ৬,০৩,০৭,৬১৬ জন। বাংলার মোট মুসলমান ৫৫ শতাংশ এবং অমুসলমান ৪৫ শতাংশ যখন বাংলার ভূখন্ড ভাগ হল তখন ৫৫ শতাংশ মুসলমান জমি পেল ৬২.৫৬ শতাংশ অর্থাৎ সংখ্যার চেয়ে ৭ শতাংশ বেশী, যার নাম পূর্ব-পাকিস্থান। আবার বাংলার ৪৫ শতাংশ। অমুসলমান জমি পেল ৩৭.৪৫ শতাংশ অর্থাৎ ৭ শতাংশের কম, যার নাম পশ্চিমবঙ্গ, গোজামিলটা এখানেই প্রথম হয়েছে। ভাগের শর্ত অনুসারে পশ্চিমবাংলার তখন ৫০ লক্ষ মুসলমানের ভাগের জমি পূর্ব - পাকিস্তানে এবং পূর্ব - পাকিস্তানের ১.২০ কোটি অমুসলমানদের ভাগের জমি পশ্চিম বাংলায় কিন্তু তা হল না, দ্বিতীয় গোজামিল এখানে। তৃতীয় গোজামিল হল, উদ্বাস্তুরা ব্যাপক হারে ছিল পশ্চিমবঙ্গ মুখী। সেই অনুপাতে পূর্ব পাকিস্তান মুখী উদ্বাস্তু ছিল না বললেই চলে। এই গোজামিলের জন্যই পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যার চাপ হওয়া স্বাভাবিক।

## দুই

### দ্বি জাতি তত্ত্বে পশ্চিম বাংলার মুসলমানরা কেন উদ্বাস্তু হল না—?

১৯৪৬ সনে এবং পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কম বেশী দুই বাংলায়ই হয়েছে। কিন্তু পূর্ব- পাকিস্থান অর্থাৎ পূর্ব- বাংলায় হয়েছে এক তরফা এবং পশ্চিম বাংলায়ও প্রথম শুরু করেছে মুসলমানরা। তবে পশ্চিম বাংলায় সাম্প্রদায়িক হানা-হানির মূলে ছিল অবাঙালি - মুসলমান, বিশেষ করে বিহারী মুসলমান । সুতরাং বাংলা ভাগ হওয়ার সাথে সাথে পশ্চিম বাংলার অবাঙালি মুসলমানরা অধিকাংশ পূর্ব- পাকিস্থানে চলে যায়। এদের সংখ্যা ২৫-৩০ হাজার । এছাড়া পশ্চিম বাংলার সীমান্ত জেলাগুলি থেকে কিছু কিছু স্থায়ী মুসলিম পরিবার জমি বিনিময়ের মাধ্যমে ওপারের সীমান্ত জেলাগুলিতে চলে যায়। এদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে যত দূর জানা যায় তার সংখ্যা ৪০ হাজারের বেশী নয়। কিন্তু ভারত সরকারের অনুরোধে তখন ২০ হাজার লোক আবার ফিরে এসেছিল। সুতরাং দুই বাংলায় উদ্বাস্তু আগমণ ও নিগমণের অনুপাত ১০০ : ১, মুসলমানদের কম চলে যাওয়ার কারণ ছিল (১) ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে (২) ভারত সরকার মুসলমানদের সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে (৩) পূর্ব-বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের জন্য উপযোগি ছিল না (৪) পূর্ব- বাংলার সংস্কৃতির সাথে পশ্চিম- বাংলার মুসলমানদের কোন মিল নেই (৫) পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা পশ্চিম- বাংলার মুসলমানদের জন্য কোন সহানুভূতি দেখায় নি। এই সমস্ত কারণে পশ্চিমবাংলা থেকে কম মুসলমান পূর্ববাংলায় চলে গিয়েছে।

## তিন

### দ্বি-জাতি তত্ত্বে পূর্ব- বাংলার হিন্দুরা কেন উদ্বাস্তু হল?

দ্বি-জাতি তত্ত্বের দেশ ভাগে মুসলিম-পূর্ব পাকিস্থান থেকে অমুসলমানরা বিতাড়িত হবেএটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কারণ পূর্ব পাকিস্থানের মুসলমানরা দ্বি-জাতি তত্ত্বকে ১০০ শতাংশ মেনে নিয়েছে। বাংলা ভাগের সময় সম্ভবতঃ ১.২০ কোটি অমুসলমান জিম্মি হিসাবে ওপার বাংলায় আটক রয়ে যায় এবং ওপার বাংলায় মুসলমানদের শরিয়ত আইন অনুযায়ী প্রথম কর্তব্য হল ১.২০ কোটি অমুসলমানদের যেন তেন প্রকারেণ তাড়িয়ে দেওয়া। সেই সূত্র অনুযায়ী ১৯৪৭ - ১৯৭০ সনের মধ্যে তারা ৬০-৭০ লক্ষ ধর্মীয় সংখ্যা লঘুদের বিতাড়িত করে। তাই ওপারের হিন্দুরা এপারে এসে উদ্বাস্তু হয়। প্রথম ১০ বছরে ওপার বাংলা থেকে ৪১.১৭ লক্ষ সংখ্যা লঘু বিতাড়িত হয়। হিন্দু নারীদের উপর অত্যাচার করে, অপরিচিত পুরুষ হত্যা করে, বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে সংখ্যা লঘুদের বিতাড়িত করে। মানুষদের জোড় করে তাড়াতে হলে যা যা করা দরকার সবকিছুই তারা সেখানে করেছে। যেমন নারী ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, লুট, মিথ্যা-মামলা, চাকরিতে বঞ্চনা সব কিছুই সমান ভাবে করেছে। বাংলাদেশ যুদ্ধে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও বিতাড়ন কমে নি।

তাই হিন্দুদের উদ্বাস্তু হবার কারণগুলি হল (১) ধর্মভিত্তিক দেশ ভাগের ফলে পূর্ব-বাংলা দখল নিতে বদ্ধ পরিকর (২) ইসলামিক নীতিতে তারা অমুসলমানদের মেনে নিতে পারে না। (৩) এপার বাংলায় মুসলমানদের প্রতি সরকার যার পর নাই সহানুভূতি দেখিয়েছে, তাই ওপার বাংলার মুসলমানেরা সুযোগ নিয়েছে (৪) পূর্ব- বাংলার হিন্দুদের সাহস করে বাস করার সাহস ছিল না। এই সমস্ত কারণে ওপার বাংলার সংখ্যা লঘুরা চিরদিন উদ্বাস্তু হয়েছে এবং মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারে নি।

## চার

## পশ্চিমবঙ্গে বাংলোভাগের কান্না

পূর্ব- পাকিস্থানের ভৌগলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক অবস্থা খুবই বৈচিত্র ময়। যেমন রাজ্যটির পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম সীমান্ত ভারত ভুখন্ড দ্বারা বেষ্টিত এবং দক্ষিন দিকে সমুদ্র। আবার পূর্বাঞ্চলে পাহাড়, উত্তরাঞ্চলে উচ্চভূমি, দক্ষিন আঞ্চলে খাল, বিল,নদীনালা এবং বঙ্গোপসাগর। যোগা যোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ ছিল সে দিন। এ জন্য বিভিন্ন জেলার মানুষদের মধ্যে একতা, ভাব বিনিময় এবং নৈকট্য বোধ ভালো ভাবে গড়ে ওঠেনি। অন্য দিকে হিন্দুদের মধ্যে জাত বিভেদ থাকায় উচ্চ বর্নের লোকেরা উচ্চ শিক্ষিত এবং আর্থিক সম্পত্তি সম্পন্ন ছিল। কিন্তু নিম্ন বর্নের লোকেরা ছিল অশিক্ষিত, গরীব, চাষী এবং জেলে। এরা প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করত। এরা অস্পৃশ্য। কিন্তু দ্বি-জাতি তত্ত্বের আঘাত এবং বাংলা ভাগের ঢেউ যখন ওপার থেকে এপার বাংলায় আছড়ে পড়েছে তখন ওপারের উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ কেউ বাদ যায় নি। সব বর্ণই এপারে এসে আছড়ে পড়েছে। তবে দুঃখের বিষয়, শহরের বাবুরা আগে পালিয়েছে। নিম্ন শ্রেনীর সাথে শহরের যোগাযোগ ছিলনা, মাটির সাথে তাদের সম্পর্ক। তাই উচ্চ বর্ণের সাথে নিম্ন বর্ণের লোক এক সাথে ভারতে চলে আসতে পারেনি। ১৯৪৬ সন থেকে ১৯৪৯সন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্থান থেকে ১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার লোক চলে আসে। তার মধ্যে বহু বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, নেতা, মন্ত্রীরা আছেন। এই সময় পূর্ব বাংলার উচ্চ বিত্ত এবং মধ্য বিত্তরা প্রায় সব চলে আসেন। এরা এখানে এসে নিজস্ব অর্থ এবং সরকারী সহযোগিতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৫০ সনের পর পূর্ব পাকিস্থানে নিম্নবর্ণ ও কৃষকদের উপর অত্যাচার শূরু হয় এবং তারপরই নিম্নবর্ণ ও কৃষকরা আসতে শুরু করে। পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের প্রকৃত দুর্দশা তখন থেকেই আরম্ভ হয়। উদ্বাস্তুদের বাঁধ ভাঙা ঢেউ আছড়ে পড়ে পশ্চিম বাংলার বুকে। মাঠে ঘাটে, সেনাবাহিনীর গুদাম ঘরে উদ্বাস্তুদের জন্য ক্যাম্প করা হয়। একটা গুদাম ঘরে কয়েক শত লোকের বাস। ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। তার মধ্যে চলে খাদ্যাভাব, জলের অভাব, বস্ত্রাভাব, চিকিৎসার অভাব এবং পায়খানার অব্যবস্থা। ফলে বসন্ত, আমাশা, কলেরায় বহু লোক মারা যায়। এর মধ্যে উদ্বাস্তুদের নিয়ে চলে বিভিন্ন রাজনৈতিক খেলা। একদিকে উদ্বাস্তুদের নিয়ে চলে বামপন্থীদের টানাটানি, অন্য দিকে

বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চলে পুনর্বাসনের জন্য কংগ্রেস- সরকারের চেষ্টা। এই দুই দলের চাপে উদ্বাস্তুদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর বারে বারে কেন্দ্রীয় সরকার চাপ সৃষ্টি করছে যাতে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের কোন রকম এখানে পুনর্বাসন না হয়, যেহেতু তাদের পূর্ব পাকিস্তান আবার ফেরত পাঠাতে হবে। এভাবে উনা পোড়েনের মধ্যে ৮২ লক্ষ উদ্বাস্তুদের মাত্র ২৩ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন হয়। তাই ১৯৭০ সালের আগে আসা প্রায় ৬০ লক্ষ উদ্বাস্তু এখনও দারিদ্রতার সাথে লড়াই করছে। ১৯৭০ সন পর্যন্ত বাঙালী উদ্বাস্তুদের এটা হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। অপর দিকে পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ১৯৫০ সনের মধ্যে পুনর্বাসন শেষ হয়। ওপার বাংলার সংখ্যালঘুরা দুই দেশেই অত্যাচারের শিকার হল এবং পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের সাথে রইল বৈষম্য। এভাবে গোঁজামিলের মধ্যে বাংলার পুণর্বাসন হল। যার ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা আজও বিদ্যমান।

## পাঁচ

### ভারত সরকার কর্তৃক উদ্বাস্তুদের শ্রেণী বিভাগ—

১৯৪৭ সন থেকে ২০১১ পর্যন্ত অর্থাৎ এই বই লেখা অবধি বিবরণে ভারত সরকার পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের তিন স্তরে ভাগ করেছেন এবং এই তিন স্তরের জন্য ৩ রকম দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়েছে এবং ৩ প্রকার নাম দিয়েছে,। যেমন—

| সন | সংখ্যা লক্ষ | নাম | সরকারী ভূমিকা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৪৭-'৭০ | ৮২ লক্ষ | বাস্তুচ্যুত Displaced Person | সরকারী স্বীকৃত | ধর্মীয় কারণে বিতাড়ন |
| ১৯৭১ | ৯৯ লক্ষ | শরণার্থী Evacuees | ১ বছরের জন্য স্বীকৃত | রাজনৈতিক কারণ |
| ১৯৭২-'০৩ | ৯০ লক্ষ- | অবৈধ আগন্তুক | সরকারী সিদ্ধান্ত | ধর্মীয় কারণে |
| | ১ কোটি | Illegal Migrant | | বিতাড়ন ও আগন্তুক |
| • | | ক) দেশ প্রেমিক | বিতাড়ন | সরকারী সিদ্ধান্ত নয় |
| | | খ) দেশ বিরোধী | আগন্তুক | |

উপরোক্ত সারণির রহস্য এই যে, ১৯৪৭ সন থেকে ২০০৩ সন পর্যন্ত পূর্ববাংলো থেকে যত উদ্বাস্তু ভারতে এসেছে, কেন্দ্রীয় সরকার কখনই তাদের উদ্বাস্তু হিসাবে মর্যদা দেয়নি। ১৯৪৭-১৯৭০ সন পর্যন্ত এদের 'বাস্তুত্যাগী' বলেছে, ইংরাজিতে বলেছে Dis-placed Person। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে ৯৯ লক্ষ লোক ৪ মাসের মধ্যে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের শরনার্থী বলা হত। এই সময় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান সব ধর্মের এবং সব সম্প্রদায়ের লোক এসেছিল। বিষয় ছিল রাজনৈতিক, এরা ১৯৭১ সনের ২৫ শে মার্চের পর ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এসেছিল তারপর ভারত

সরকার [illegible] নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। ১৯৭১ সনের পর ২০০৩ সন পর্যন্ত যারা এসেছে [illegible] সব অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। তাই মন্তব্য [illegible] যে, ভারত সরকার এদের [illegible] উদ্বাস্তু বলেনি। যেহেতু উদ্বাস্তু আখ্যা দিলে ভারত সরকারের দায়-দায়িত্ব এসে [illegible] অনেক, এটা আন্তর্জাতিক নিয়ম।

১৯৭২ সনের পর ২০০৩ সন পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর যারা ভারতে এসেছে তারা সবচেয়ে বিতর্কিত মানুষ। যেহেতু এরা উদ্বাস্তুও নয়, বাস্তুচ্যুতও নয়, শরণার্থীও নয়। এদের সরাসরি অবৈধ আগন্তুক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ঘোষণা বিচারালয় বা সরকার [illegible] করেছে ভারতীয় জাতীয় সংসদ। সরকার করলে যখন তখন রাজনৈতিক চাপে তুলে নিতে পারে, কিন্তু জাতীয় সংসদ এমনই এক প্রতিষ্ঠান যা ভারতীয় আইনের সর্বশেষ প্রতিষ্ঠান। এখানে স্বয়ং রাষ্ট্রপতির ও কোন হাত নেই, যার বিরুদ্ধে কোনো বিচারালয় কোনো নির্দেশ করা যায় না। সরকার এভাবে বাঙালি উদ্বাস্তুদের ৩ ভাগে ভাগ করেছে। সুতরাং এ সমস্যার সমাধাণ খুব সহজ সাধ্য নয়।

## ছয়

## বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শরণার্থীরা ৮০ শতাংশ হিন্দু কেন?

১৯৭১ সন, উপমহাদেশের ইতিহাসে সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। এই সনে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান ভেঙে যুদ্ধের মাধ্যমে আর একটি স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের প্রায় এক লক্ষ সৈন্য ভারতীয় সেনা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এছাড়া প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। এত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে যে দেশটির সৃষ্টি হয়— সে দেশটির নাম "বাংলাদেশ"। মুক্তিযোদ্ধাদের একাগ্রতা, শরণার্থীদের আত্মত্যাগ এবং ভারতীয় সেনাদের বীরত্ব, এই সম্মিলিত তিন অবদানে ধর্মকে উপেক্ষা করে বাঙালী জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়। কিন্তু একটা সামরিক সরকারের হাত থেকে একটা অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন করা, নিশ্চয়ই তা সহজ পথে হয় নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য পাকিস্থানের সামরিক সরকার ভারতকে সম্পূর্ণ দায়ী করল এবং পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যা লঘুদের ভারতের দালাল মনে করে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করত। সেই অত্যাচারের নির্মম কাহিনী কোন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পাকিস্থানের সামরিক বাহিনী এবং মুসলিম মৌলবাদীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ৩০ লক্ষ নিরীহ লোককে হত্যা করেছে, যার প্রায় ২৫ লক্ষ ছিল হিন্দু। সংবাদে যতটুকু জানা যায় প্রায় ১৫ লক্ষ নারী ধর্ষিতা হয়েছে এবং তার ৮০ শতাংশ হিন্দু মহিলা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সেখানের মৌলবাদীরা ৯৮ লক্ষ বাংলাদেশীকে ভারতে তাড়িয়ে দিয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ৫.৫ লক্ষ ছিল মুসলমান বাকি প্রায় সব হিন্দু। হিন্দুদের সমস্ত বাড়ীঘর এবং পূজাপ্রতিষ্ঠানগুলি জ্বালিয়ে দিয়েছে। হিন্দু

বুদ্ধিজীবী এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদের হত্যা করেছে এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো লুট করেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ১০০ শতাংশ বলি হয়েছে সেখানের সংখ্যালঘুরা। কোনও হিন্দু পরিবার অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এ কারণেই ৮০ শতাংশ শরণার্থী হিন্দু ছিল।

## সাত

### ১৯৭১ সনে শরণার্থীরা ভারতে আশ্রয় নেবার পর যা যা ঘটেছে

এক দেশ থেকে শরণার্থী হয়ে অন্য দেশে চলে এলে তাদের দুরবস্থার সীমা থাকে না, কিন্তু ১৯৭১ সনে ভারত সরকার এবং বিদেশী সংস্থাগুলো যে সাহায্য করেছিল তা অতুলনীয়। এক সাথে ৯৮ লক্ষ শরনার্থীকে আশ্রয় দেওয়া ইতিহাসে বিরল। ভারত সরকার তখন ৮০৭ টি শরনার্থী শিবির তৈরি করেছিল। ৬৭,৩১,০০০ জন শরনার্থী এই শিবির গুলোতে ছিল, বাকি সব ক্যাম্পের বাইরে ছিল। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ছিল ৭৩লক্ষ। ১৯৭১ সনে জুলাই মাসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট— ইয়াহিয়া খান শরনার্থীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা করায় মুসলিম শরনার্থীরা সব বংলা দেশে চলে যায়, হিন্দুরা যায়নি।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের ডাকে সেদিন যদি হিন্দু শরনার্থীরা পূর্ব পাকিস্থানে চলে যেত, তা হলে বাংলাদেশ আর স্বাধীন হত না।

বিতাড়িত শরনার্থীরা ১ খানা কাপড় পড়ে শূন্য হাতে ভারতের শরনর্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। পরিবারের কে কোথায় আছে কোন খোঁজ নেই। ক্যাম্পে রান্নার উনুন থেকে খাবার থালা, শোবার বিছানা সবই দানের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র, জল, জ্বালানি, ওষুধ সব কিছুর জন্য লাইন দিতে হত। মহিলাদের খুব ভোরে চালের জন্য লাইন দিতে হত। শিশুদের রুটির জন্য লাইন দিতে হত, বাচ্চা মেয়েদের ভোরের অন্ধকারে জলের জন্য লাইন দিতে হত, জ্বালানির জন্য পুরুষদের বহু মাইল হাটতে হত। এই ছিল শরনার্থীদের দৈনন্দিন জীবন। এছাড়া ১০ ফুট x ১০ তাবুর ঘরে, ৫ থেকে ৬ জন লোকের বাস করতে হত। কোথাও বৃষ্টির জলে ঘর ডুবে যেত। তার মধ্যে জ্বর, আমাশা, কলেরা, বসন্ত, চোখ ওঠা ইত্যাদি সব সংক্রামক ব্যাধিতে শিবিরগুলি মহামারি আকার ধারণ করে। ১০ মাসের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক মারা গিয়েছে, তার মধ্যে ১০ লক্ষ শিশু। এমনি করে বিতাড়িত শরনার্থীদের জীবন কেটেছে এপারেরশরনার্থী শিবির গুলিতে। ওপারে গুলির মুখে স্বজন হারাদের কান্না, এপারে মহামারীর মৃত্যুতে স্বজন হারাদের কান্না। "হায়রে স্বাধীনতা, হায়রে দেশ ভাগ।।

এই বিপদের মধ্যে ভারত সরকার শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করে। এই বিজ্ঞপ্তি তে বলা হয়েছে যে, শরণার্থীদের অবশ্যই বাংলাদেশে ফেরৎ যেতে হবে, কোনও বাংলাদেশীকে ভারতে আর নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। বিজ্ঞপ্তি নং ২৬০১/১৬/৭১-

১০ আং ২৯/১১/১৯৭১ নিউদিল্লী। ১৯৪৯ সনে নেহেরু ডাঃ বিধান রায়কে চিঠি দিয়ে প্রথম নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা ১৯৭০ সন পর্যন্ত কার্যকারি হয়েছে। ১৯৭১ সনে কেন্দ্রীয় সরকার শরনার্থীদের উদ্দেশ্যে যে নোটিশ দিয়েছিল সেই নোটিশ ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে আইনে রুপান্তরিত হয়। এরপর থেকে বাংলাদেশীরা শত অত্যাচারে ভারতে আশ্রয় নিলেও ভারত সরকার এদের স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দিতে চায় না। বিজ্ঞপ্তিটি নীচে অষ্টম ভাগে দেওয়া হয়েছে। ২০০৩ সনের নাগরিকত্ব আইন ওখান থেকে শুরু। জীবনের নিরাপত্তা কখনও আইন মানে না, জীবন বড় বালাই। তাই যখনই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা রাষ্ট্রীয় অত্যাচারে নিপীড়িত হয়েছে, তখনই ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পিতৃহারা, মাতৃহারা, পুত্রহারা, কন্যাহারা, স্বামীহারা, স্ত্রীহারা, ভ্রাতৃহারা শরনার্থীরা বুক ভরা আশা নিয়ে তাদের পোড়া ঘর বাড়িতে আবার ফিরে গিয়েছিল। তখন মনের ভুলেও তারা কল্পনা করেনি যে, মাতৃভুমি থেকে আবার বিতাড়িত হবে। কিন্তু সেই অকল্পনীয় দুর্ভাগ্য আবার তাদের তাড়া করল। পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুরা এ কূল ও কূল দু কূল হারালো।

## আট

## বাংলাদেশীদের নাগরিকত্ব না দেবার প্রথম বিজ্ঞপ্তি জারি কবে এবং কেন?

পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে প্রথম নির্দেশ জারি হয় ১৬/০৮/১৯৪৮ তারিখ। এই নির্দেশে তাদের আগমন বন্ধ করতে বলা হয়। নাগরিকত্বের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় ১৯৭১ সনে। নিম্নে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল—

**বিজ্ঞপ্তি**

এক্সপ্রেস লেটার নং ২৬০১/১৬/৭১-১০ তাং ২৯/১১/১৯৭১, নিউ দিল্লী

সমস্ত রাজ্যসমূহ, কেন্দ্রশাসিত রাজ্যসমূহের মুখ্য সচিবগণ ও প্রশাসনের প্রতি—

*বিষয়— ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান। এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের নিকট থেকে ভারতে নাগরিকত্ব দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না বলে নির্দেশ।*

যেসব উদ্বাস্তু ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের পর পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে এসেছে তাদের ভারতবাসী বলে গণ্য করা যায় না। সুযোগ হলেই তাদের জন্মস্থানে তাদেরকে ফিরে যেতে বলা হবে। ১৯৫৫ সালের ভারতের নাগরিকত্বের আইনের ৫/১/এ নং ধারা এবং ১৯৫৬ সালের নাগরিকত্ব নিয়মাবলী অনুসারে ভারতের নাগরিক হিসাবে তাদের নাম [illegible] হবে না। [illegible] নাগরিক হিসাবে তালিকাভুক্ত করার জন্য ভারতের নাগরিকত্ব আইনের ৫/১/এ ধারাসম্বন্ধের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান বিষয়ে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের পর পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে সে ভারতের নাগরিক

হিসাবে নাম রেজিষ্ট্রি করার অযোগ্য। কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে এবং আগেকার তারিখ দিয়ে দরখাস্ত করল কিনা তা বিশেষভাবে অনুসন্ধান যোগ্য। এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আপনার অধীনস্থ সমস্ত নাম নথিভুক্তকারী কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে জানিয়ে দিতে হবে।

স্বাঃ-সি.এল. গোয়েল

আন্ডার সেক্রেটারী, ভারত সরকার

এই বিজ্ঞপ্তির বিশেষত্ব হল বাংলাদেশী সংখ্যালঘুদের ভারতে আশ্রয় নেবার জন্য সময়ের সীমারেখা টেনে দেওয়া হল, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় cut of year, অর্থাৎ ঐ সময়ের পরে আর 'না'।

## বিজ্ঞপ্তি জারি কেন?

ভারত সরকার কেন ১৯৭১ সনে এই নির্মম বিজ্ঞপ্তি জারি করল? তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। তিনি এই শিক্ষাটি পেয়েছিলেন তারা বাবা নেহেরুর কাছ থেকে ১৯৪৮ সনে। ২০০৩ সনে যে আইন করা হয়েছে তা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী পেয়েছিলেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে। ২০০৩ সনের আইনের প্রেক্ষাপট দেশভাগের যন্ত্রণা বইয়ে প্রথম ভাগেই দেওয়া হয়েছে। তবে ১৯৭১ এবং ২০০৩ সনের প্রেক্ষাপট ভারতে আগত প্রত্যেক পূর্ববঙ্গীয় বাঙালির একান্তই জানা দরকার। কারণ এটা বাংলার আধুনিক ইতিহাস। এই সমস্যাটির সমাধান খুঁজে বার করা খুবই কঠিন, যেহেতু সমস্যাটির সাথে স্বাধীনতা, দেশভাগের তত্ত্ব, উদ্বাস্তু, অনুপ্রবেশ এবং ভারত-পাকিস্থান এবং বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি জড়িত।

১৯৪৭ সনে যে অন্যায়ের জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে অবাস্তব ভৌগলিক সীমারেখা টেনে পূর্ব পাকিস্থান সৃষ্টি করা হল, কোন দেশপ্রেমিক ভারতবাসী কোনদিন তা সহজভাবে মেনে নিতে পারবে না। তাই ভারতবাসী সব সময় চেয়েছিল দুই বাংলার সাধারণ মানুষের স্বার্থে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ বাংলা সংস্কৃতির স্যাথে মিশে যাক এবং বাংলায় কোনো ধর্মীয় বিভেদ না থাক। এটা কোনো সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নয়, উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তির জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে কাশ্মীর সমস্যা মিটে যাবে। ১৯৭১ সনে ভারতের হাতে একটা মোক্ষম সুযোগ এসেছিল। সরকার সেই সুযোগের মাত্র ৭৫ শতাংশ কাজে লাগিয়েছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির সর্বশেষ ইতিহাস শেখ মুজিব জানতেন না, জানতেন না সেদেশের অনেক মন্ত্রী, তবে স্বাধীনতার সব রহস্য জানতেন— দুই জন লোক মাত্র। তার একজন হলেন চিত্তরঞ্জন সুতার ও অন্যজন হলেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। কিন্তু তারা আজ জীবিত নেই। তবে এ বিজয় সহজ পথে হয় নি। শেখ মুজিব পাকিস্থানের কাছে আত্মসমর্পণ করে যে ভুল করেছিলেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়ন করে ঠিক তদ্রূপ একটা ভুল করেছিলেন। যার ফলে ভারতে ৯৯ লক্ষ শরণার্থী এসেছে এবং আগের ভুলের ক্ষতিপূরণ হয়েছে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ সুগম হয়েছে। কারণ শরণার্থী আগমনের জন্যই পাক-ভারত

যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধের ফলেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু প্রথম জানা দরকার, যে স্বাধীনতার জন্য পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, যুদ্ধ শুরু হবার সাত দিন আগেই ভারতে তাদের নিজেদের [illegible] বলে কয়ে, কোনো আলোচনা না করে, তাদের [illegible] যাবার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল, কিন্তু কেন? এসবই ছিল রহস্যময়। ১৭/০৪/১৯৭১ তাং বাংলাদেশের কৃত্রিম রাজধানী ভারত সীমান্তের কাছে মুজিব নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু প্রকৃত রাজধানী ঢাকা তখন পাক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। মুজিব নগরে বাংলাদেশের স্বাধীন সরকার গঠিত হয়। অপরদিকে নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে ভারতের গোয়েন্দা দপ্তর জানতে পেরেছে যে, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে শেখ মুজিবর রহমানকে আসনে রেখে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হবে এবং সেখানে শেখ সাহেবকে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানানো হবে যার জন্য শেখ সাহেব বহুদিন আলোচনা করেছিলেন। অথচ বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারের নেতৃত্বে স্বাধীনতার জন্য যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে শেখ মুজিব তা কিছুই জানতেন না, বরং পাকিস্তানের অধীনে বাংলাদেশের অবস্থা স্বাভাবিক এটাই শেখ সাহেবকে পাক সরকার জানিয়েছিল। সুতরাং পাক সরকার শেখ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করে উভয়ে পাকিস্তানকে অটুট রাখার পরিকল্পনা করেছিল যাতে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন ভেস্তে যায়। তাই ভারত সরকার দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের পরিবর্তে অবিলম্বে সার্বিক যুদ্ধের পরিকল্পনা নিল এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ করে শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর পরিকল্পনা করা হল। কারণ শেখ সাহেব পাকিস্তান মন্ত্রীসভা গঠন করলে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে না এবং শরণার্থীরা দেশে ফিরতে পারবে না। তাই যুদ্ধজয়, বাংলাদেশকে স্বাধীন করা এবং শরণার্থীদের ফেরৎ পাঠানো এ ৩ টি কাজ জরুরি ভিত্তিতে করার পরিকল্পনা করা হল এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সাথে সাথে শরণার্থীদের ফেরৎ পাঠাতে শুরু করল—(১) শরণার্থীদের চাপ ভারত সরকার দীর্ঘদিন বইতে পারবে না (২) বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে না তাই ভারত সরকার শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে এইরূপ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। তৃতীয় কারণ হল,— ভারত সরকার ভেবেছিল যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আর কোনওদিন এখানে শরণার্থীর সমস্যা হবে না। সুতরাং শরনার্থীদের দেশে পাঠানো হোক।

## নয়

### ১৯৭১ সনে শরণার্থীরা আবার কেন ওপার বাংলায় চলে গেল ?

১৯৭১, ৩০ শে এপ্রিলের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ পাক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। মাঠে ঘাটে অফিস, আদালত, বাজারহাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, প্রশাসন সর্বত্র স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। কোথাও কোন প্রতিরোধী শক্তির চিহ্ন মাত্র নেই। কেউ আর আওয়ামী লীগ বা স্বাধীনতা পন্থী বলে পরিচয় দিত না। কিন্তু হিন্দুদের পরিচয় গোপন

রাখার কোন উপায় ছিল না। কারণ, খুব সহজেই সব মুসলমান মুসলিম লিগ হয়েছে। বিশেষ করে এই সময় মুসলিম মৌলবাদী শক্তি পাক বাহিনীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, ঐই বিদ্রোহে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মুসলমানদের কোনও দোষ নেই, শুধু বাংলা দেশের হিন্দুরাই পাকিস্তানকে ভাঙার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এবং ভারত সরকার আওয়ামি লিগ নেতাদের মদত দিচ্ছে। তাই এই বিদ্রোহের জন্য বাংলাদেশী হিন্দু এবং হিন্দুস্থানই দায়ী। পাক বাহিনী এটাই সত্য ঘটনা বলে ধরে নিয়েছিল। তার পর থেকে বাঙালীত্ব বাদ দিয়ে শুধু হিন্দুর উপর অত্যাচার শুরু করল এবং হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের দেশ ছাড়া করল এবং নারী ধর্ষণ শুরু করল। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু প্রাণ দিল। ধর্ম নিরপেক্ষতার জন্য লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারী ইজ্জত দিল, জাতীয়তা বাদের জন্য ৯৮ লক্ষ লোক শরনার্থী হ'ল। এভাবেই বাংলাদেশ স্বাধীন হল। কিন্তু এত অত্যাচারের পর শরনার্থীরা কেন বাংলাদেশে ফিরে গেলেন এ বড় কঠিন প্রশ্ন। বাংলাদেশে শরনার্থীরা বিনা চুক্তিতে ফিরে যাবে তাই আমি তখন তার বিরোধিতা করেছিলাম। যেহেতু গৃহযুদ্ধের মধ্যেও আমি চারবার বাংলাদেশে গিয়ে শরনার্থীদের পথ দেখিয়েছি। কিন্তু মাটির টান বাঁধ মানে না। অপর দিকে সেই সময় শরনার্থীদের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ শরনার্থীরা ফিরে না গেলে বাংলাদেশ সরকার ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ প্রমাণে ব্যর্থ হবে। ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলির স্বীকৃতি আদায় অসম্ভব হবে। বাংলাদেশের এই অসুবিধাগুলির কথা চিন্তা করে পিতৃহীন, মাতৃহীন, ভ্রাতৃহীন, সন্তানহীনতার ব্যাথা নিয়ে শরনার্থীরা পোড়া ভিটে মাটিতে আবার ফিরে গেলেন, কিন্তু আজও তারা কোনও মর্যাদা পায়নি, আজও সেখানে তারা কাফের বলে পরিচিত।

## দশ

## বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সংখ্যালঘুরা আবার কেন উদ্বাস্তু ?

১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা উপলক্ষে পাক ভারত যুদ্ধ শুরু হবার এক সপ্তাহ আগে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত হল যে, বাংলাদেশ আর মুসলিম মৌলবাদী দেশ হবে না, সে দেশ হবে সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ গনতান্ত্রিক স্বাধীন দেশ। সুতরাং বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের আর ভারতে আশ্রয় দেওয়া হবে না, চিন্তা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত। ভারত সরকার কোনও বাংলাদেশীকে নাগরিকত্ব না দেবার বিজ্ঞপ্তি সাথে সাথে জারি করে দিল। মুসলিম দেশ সম্পর্কে ভারত সরকারের এটা ৪র্থ ভুল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার ৪ বছর পর জাতির পিতা শেখ মুজিবর রহমান মুসলিম মৌলবাদের [illegible] নিহত হলেন। মুসলিম মৌলবাদ স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করল। ধর্ম নিরপেক্ষতার অবসান হল। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হিসাব ভুল প্রমানিত হল। সেখানে শরিয়তের আইন চালু হল। মুসলিম মৌলবাদীদের অভিজ্ঞতা আছে যে, হিন্দু শরনার্থীদের দ্বারা বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সুতরাং হিন্দুরাই বাংলাদেশের বড় শত্রু,

সূত্রঃ বাংলাদেশের বাৎসরিক পরিসংখ্যান ১৯৪২, ১৯৮৩, ১৯৯৩, ২০০১

পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুরা এভাবে ১৯৪৭ সনে বাংলা ভাগের বলি হয়ে পূর্ব বংলায় নির্যাতীত হয়েছে এবং পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হয়েছে। আবার ১৯৭১ সনে খণ্ডিত বাংলা স্বাধীন হল, সেই স্বাধীনতার জন্য পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুরা শরনার্থী হল। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তৃতীয়বার ওপার বাংলার সংখ্যালঘুরা উদ্বাস্তু হতে শুরু করল। এখন প্রশ্ন— বাংলাভাগ হয়ে পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের ওপার বাংলায় এবং এপার বাংলায় কতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করেছে, বা এতটুকু স্বাধীনতার সুফল কোথাও ভোগ করেছে কিনা? ইংরেজকে তাড়িয়ে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে যে ফল ওপার বাংলার সংখ্যালঘুরা ভোগ করেছে, পাকিস্থানীদের তাড়িয়ে ১৯৭১ সনে এবং পরে সেই একই ফল ওপার বাংলার সংখ্যালঘুরা ভোগ করেছে। তাই স্বাধীনতার সুফল নয়, দেশভাগের সমস্ত কুফল এরা ১০০ শতাংশ ভোগ করেছে।

১৯৭১ সনের বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার পরের অধ্যায় পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের কাছে এক করুণ পরিণতি, তাই তারা ভারতে চলে আসেন।।

২০১১ সনে হাসিনা সরকার ইসলামিক আইন বাদ দিয়ে মৌলবাদীদের ভয়ে সংবিধানকে ধর্ম নিরপেক্ষ করতে পারেনি।

## এগারো

## যারা বাংলা ভাগের বলি ভারতে তারাই কেন আইনের শিকার?

বাংলা ভাগের ফল ওপার বংলায় সংখ্যালঘুরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে এখন ও টের পাচ্ছে। আবার এপর বাংলায় এসেও প্রতি মুহূর্তে টের পাচ্ছে দেশ ভাগের কী জ্বালা। ১৯৭১ সনের পরে এসে তারা উদ্বাস্তু হিসাবেও স্বীকৃতি পাচ্ছে না, পাচ্ছে অবৈধ আগন্তুক হিসাবে। অথচ স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই আগন্তুকদের ভারতীয় হিসাবে গ্রহন করার প্রতিশ্রুতি ছিল। এমন কি রাষ্ট্র সংঘের শর্ত অনুসারে ও এরা 'উদ্বাস্তু'। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যায় না। তাহলে স্বাধীনতাকে অপমান করা হয়।

এই উদ্বাস্তুরা এখানে এসে অসহায় অবস্থায় রেল লাইনের গায়ে, খাল ধারে, ঝিলের পাড়ে, ঝুপরি ঘরে ১৫/ ২০ বছর স্থায়ী ভাবে বসবাস করছে, আর বাংলাদেশে ফিরে যায় নি। প্রায় সব পরিবারের এখানে দ্বিতীয় প্রজন্ম চলছে। কোনও কোনও পরিবারের এখানে ওর প্রজন্ম শুরু হয়েছে। তারা চিরদিনের জন্য বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারিয়েছে। তারা আর কোনদিন বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারবে না, ভারতবর্ষকে তারা তাদের নিজেদের দেশ হিসাবে ধরে নিয়েছে। এরা সৎ, কর্মঠ, আত্মনির্ভরশীল এবং সৃষ্টিশীল শক্তি। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বহু ছেলে এসেছে। এদের মধ্যে আছে কলা ও বিজ্ঞান শাখার ছেলে, তাদের অনেক ডাক্তার ইনজিনিয়ার। তাদের

ওখানে [illegible] বলে চাকরী নেই এখানে বিদেশী বলে চাকরি নেই। শান্তির পথ একটাই, আত্মহত্যা। আবার গরীব মানুষের রেশন কার্ড নেই। তাই বি.পি.এল এ নাম নেই এবং ১০০ বছরের বয়স হলেও বৃদ্ধ ভাতা পাবে না। এ ভাবে দেশ ভাগের যত যন্ত্রণা সব পূর্ব বাংলার দেশ ভাগের বলি প্রাপ্ত মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। তাদের নাগরিকত্ব দূরের কথা উদ্বাস্তু ও কলঙ্কে চায় না এবং তাদের বিরুদ্ধে ভারত সরকার আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে এবং এই আইন অনুযায়ী তারা বিদেশী এবং বিদেশী বলেই তাদের পুশ ব্যাক করা হবে। তাই উদ্বাস্তুরা ও পারে বাংলা ভাগের বলি, এ পারে আইনি শিকার। এখন সরকারের কাছে প্রশ্ন, আইনের বলি কী এরাই হবে?

## বারো

## বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের অভিযান

১৯৯১ সনে মোহাজির [illegible] আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবাংলায় অনুপ্রবেশ কথাটি প্রকাশ্যে এসে যায়। ১৯৭৮ সন থেকে উদ্বাস্তু নিয়ে আন্দোলন হয়েছে। তখন মানুষ আমাদের 'বাংলাদেশী' বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু ১৯৯১ সনে বাংলাদেশ থেকে আগত সব শ্রেণীর অনুপ্রবেশকারী রূপে আখ্যায়িত হয়। তারপর থেকে সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে এবং মুসলিম তোষণের জন্য উভয় সাম্প্রদায়কে সমদৃষ্টিতে বিচার করেছে। শুধু তাই নয় শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, রাজনৈতিক দল এবং সংসদ এই অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে, কিছুতেই পৃথক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে বিচার করতে রাজী নয়। তাই ভারতীয় সংসদ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের জন্য ২০০৩ সনে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে প্রকৃত ভারতীয়দের 'জাতীয় পরিচয় পত্র' প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সাথে সাথে অবৈধ আগন্তুকদের নাগরিকত্ব না দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ফলে বাঙালী উদ্বাস্তুরা বিদেশ বেনাগরিক হয়ে যাচ্ছে। তার পর থেকে সরকার এবং বিচার বিভাগ অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি জারি করে চলেছে। অবশ্য ২০০৩ সনের আগে [illegible] করেছে। যেমন —

● [illegible] — ভারত সরকারের ঘোষনা— কোনও বাংলাদেশীকে ২৫ / ০৩ / ১৯৭১ তারিখের পর আর ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না।

● ১৯৭৮ সন — মরিচ ঝাপির উদ্বাস্তু বসতিতে গণহত্যা —

● ১৯৮৭ সন — নাগরিকত্ব আইন সংশোধন

● ২০০৩ সনে - নাগরিকত্ব আইন সংশোধন — অনুপ্রবেশকারী ঘোষনা, বংশানুক্রমে [illegible]।

● ১২/১২/২০০৩ - বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদেরও ফেরত যেতে হবে। ২০০৩ সনে নাগরিকত্ব আইন নিয়ে যে সংসদীয় কমিটির [illegible] হয়, সেই বৈঠকে স্থির হয়ে যে, নানা কারণে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা সে দেশের সংখ্যালঘুদের দরাজ

হ্যতে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া উচিত নয়। এই শরনার্থীদের সাথে আন্তর্জাতিক আইন ব্যবহার করা উচিত।

● ১৮/০২/২০০৪ - দিল্লী থেকে বাংলাদেশীদের ফেরত পাঠাতে হবে — দিল্লী হাইকোর্ট

● ১০/১২/২০০৪ - বাংলাদেশীদের রেশন কার্ড ও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাতিলের জন্য সুপ্রিমকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কাছে নোটিশ পাঠায়, মামলা করে "ইমেজ ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন"।

● ১৭/০৩/২০০৫— দিল্লী হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, বাংলাদেশীদের জমি ও রেশন কার্ড কেড়ে নিতে হবে, জনস্বার্থ মামলা।

● ১৮/০৩/২০০৫— রাজ্য ভোটার তালিকায় বাংলাদেশীদের নাম থাকার জন্য অভিযোগ করে লোকসভায় শোরগোল ফেলে দেন তৃণমূল নেত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয় তাকে বলতে না দেওয়ায় ভোটার তালিকার কপি স্পীকারের দিকে ছুঁড়ে মারেন এবং লোক সভার সভ্য পদ ছেড়ে দেন। তারপর নির্বাচন কমিশন উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেন।

● ১১/৯/২০০৫— বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ সম্পর্কে কেন্দ্রকে পশ্চিমবঙ্গে মনিটরিং সেল খুলতে বলে দিল্লী হাইকোর্ট।

১৮/০২/২০০৬— নদীয়া জেলায় চাপড়া থানার কদুইগাছি গ্রামে নাগরিকত্ব না থাকার কারণে পুলিশ শতাধিক লোককে গ্রেপ্তার করে। তারা ১৮/১৯ বছর সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, তাদের রেশন কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র সবই ছিল, এমনকি বাড়ীর দলিল পত্র ছিল, নেই নাগরিকত্বের প্রমাণ।

● ১৩/০৩/২০০৬— ভোটার তালিকা থেকে বাংলাদেশীদের নাম বাদ দিতে হবে।

— সম্পাদকীয়, বর্তমান।

● ২৭/০৪/২০০৬— 'জাতীয় স্বার্থে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি চলবে না।' বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে ২৬/০৪ তারিখ খুব কড়া ভাষায় এই মন্তব্য করেছে, হাইকোর্ট। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত এবং দেশে ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি কী কী করেছে, তা জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট।

● ০২/০২/২০০৭— ভোটার তালিকায় নাগরিকত্বের যাচাই করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যনির্বাচন কমিশনার।

● ০৫/০৩/২০০৭— ভারতীয় নাগরিকত্ব না থাকার অভিযোগে, গড়বেতা-৩ পঞ্চায়েত সমিতির [illegible] সি. পি. এমের সদস্য কমল সাহাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, কমলবাবু নাগরিকত্বের কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি।

● ২৫/০৮/২০০৬— ইসলামপুর মহকুমার ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েতে উত্তম বর্মণ নামে

এছাড়া ১৯৭৭ সনে বাংলাদেশের উগ্র সন্ত্রাসবাদী এবং মুসলিম মৌলবাদের প্ররোচনায় পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় জনবিন্যাস ঘটানোর উদ্দেশ্যে সেখানের সাধারণ মুসলমান সীমান্তের দুর্বলতা ও দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবাংলায় অনুপ্রবেশ করে। পশ্চিমবাংলার সীমান্ত জেলাগুলির মুসলমানরা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এদের সর্বোতভাবে সহযোগিতা করে। এরা পশ্চিমবাংলার সম্পদ লুট করে বাংলাদেশে নিয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এদের প্রায় সকলেরই রেশন কার্ড হয়েছে, ভোটার তালিকায় নাম তুলেছে এবং একজন ভারতীয় নাগরিকের মতন সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। অপরদিকে এরা বাংলাদেশেরও নাগরিক। অধিকাংশ লোকের দুই দেশে ঘর বাড়ী আছে এবং স্ত্রী পুত্র আছে। বাংলাদেশ থেকে সংখ্যা লঘু বিতাড়নে এরাই লাঠিয়ালের ভূমিকা নিয়েছে। সামাজিক অভিনয় এরা ভালই জানে। তাই এদের উপর উদ্বাস্তুদের ভীষণ রাগ, এদের সাথে উদ্বাস্তুদের যে কোনও মুহুর্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যেতে পারত যা ৭/৯/২০১০ তারিখ বারাসাত 'দেগঙ্গা'য় তা হয়েছে। ভারত এদের সংখ্যা এক কোটির উর্দ্ধে, এরা ভারতে ৫ম অনুপ্রবেশকারী।

এই অনুপ্রবেশকারীরা ভারত সরকারকে এত দুর্বল মনে করে যে বিগত ২৩/১/১৯৯১ তারিখ তারা "মোহাজির সঙ্গ" নামে একটি সংগঠন তৈরী করে। ১২/০২/১৯৯১ তারিখ ভারতীয় নাগরিকত্বের দাবিতে তারা কোলকাতায় প্রকাশ্যে জনসমাবেশ করে। ১৩/০২/১৯৯১ তাং বিভিন্ন বড় বড় দৈনিক পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। পুলিশ তখন একজনকেও ধরে নি। তবে তখন থেকেই ভারত সরকার অনুপ্রবেশ সম্পর্কে খুব সতর্ক হয়। সাথে সাথে ধর্ম নিরপেক্ষ <u>ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে আগত সকল শ্রেণীকে অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দেয়।</u>

<u>বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুদের এই প্রথম অনুপ্রবেশকারী হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।</u>

## চৌদ্দ

## নাগরিক আইনের বলি কারা হবে ?

ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃ নিরাপত্তার জন্য অনুপ্রবেশের সমস্যা একটি জটিল সমস্যা। এই অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের জন্য জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য দপ্তর নিশ্চয়ই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। দেশের স্বার্থে আমরা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই। কিন্তু আইন করেই অনুপ্রবেশের সমস্যা সমাধান করা যাবে না, কেননা সমস্যাটির সাথে ১৯৪৭ সনের ধর্মভিত্তিক দেশভাগ জড়িত, অপরদিকে প্রতিবেশী [illegible] অনুপ্রবেশে মদত দিয়ে আসছে। সে কারণে সমস্যাটি যেমনি জটিল তেমনি খুব স্পর্শকাতর। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে, তাই বলে বাংলাদেশ সৃষ্টির কারণ দেখিয়ে ১৯৭১ সনকে ভিত্তি বর্ষ ধরে বাংলাদেশ থেকে

বিতাড়িত হওয়া সংখ্যালঘুদের উপেক্ষা করে অনুপ্রবেশকারী বলা যায় না। পূর্ব পাকিস্থানের মুসলিম মৌলবাদীরা সংখ্যালঘুদের প্রতি যে আচরণ করত, বাংলাদেশের মুসলিম মৌলবাদীরা সংখ্যালঘুদের উপর একই আচরণ করে। ১৯৭১ সনের আগে এবং পরে একটা পার্থক্য ছিল, যেমন পূর্বপাকিস্থান থেকে আগত বাঙালী উদ্বাস্তু ছিল একধর্মী এবং এক ভাবমুখী। কিন্তু বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর উদ্বাস্তুরা আগের মতন একমুখী কিন্তু অনুপ্রবেশকারীরা বহুমুখী। দ্বিতীয়তঃ সমস্যা সমাধানে সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য বিভিন্ন কারণে যেমন—

ক) বহিরাগত লোকদের সংখ্যা এত ব্যাপক যে, পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার এরা এক তৃতীয়াংশ। (খ) পশ্চিমবাংলার মুসলিমরা অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়দাতা। (গ) বাংলাদেশ থেকে প্রধানতঃ দুই বিপরীত ধর্ম, বিপরীত চরিত্র এবং বিপরীত উদ্দেশ্যের মানুষের এখানে অনুপ্রবেশ ঘটছে। (ঘ) একটা দেশপ্রেমিক শক্তি আর একটা দেশ বিরোধী শক্তি অথচ সরকার দুই শ্রেণীকে এক করেও চিহ্নিত করতে পারবে না, আবার দুই করেও চিহ্নিত করতে পারবে না। (ঙ) এরা রাজনৈতিক দলের ভোট ব্যাঙ্কের কাজ করে, তাই রাজনৈতিক দলগুলো এদের ব্যবহার করে।

এছাড়া একটি আইন সংক্রান্ত সমস্যা আছে। যেমন, যারা প্রকৃত অনুপ্রবেশকারী, তারা প্রায় সকলেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে টাকা দিয়ে রেশন কার্ড করেছে, নেতা ধরে ভোটাধিকার পেয়েছে, ভারতীয় রমনী বিয়ে করে ভারতবাসী সেজেছে, সুতরাং সংসদের আইন, বিচার বিভাবের নির্দেশ এবং সরকারী প্রচেষ্টা এই শ্রেণীর ক্ষেত্রে কোনটাই সফল হবেনা।

অপরদিকে ১৯৪৭ সনের ধর্মীয় বিভাজনের প্রতিক্রিয়ার ফলে ১৯৭১ সনের পরেও যারা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তারা দেশ বিরোধী নয়, নিঃসন্দেহে তারা দেশপ্রেমিক। এই আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে যারা আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন, তারা টাকা দিয়ে রেশন কার্ড করেছে এবং ভোটার তালিকায় নাম তুলেছে। আবার কখনও কখনও রাজনৈতিক দলগুলি চক্রান্ত করে ভোটার তালিকা থেকে এদের নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছে। নাগরিকত্বের প্রমান না থাকায় কোথাও কোথাও এদের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস হচ্ছে। এই বিতাড়িত এবং আশ্রয়প্রার্থী অধিকাংশ উদ্বাস্তুরাই গরীব, সরল, অসহায় এবং ৯৫ শতাংশ অশিক্ষিত। তাই তারা এখানে ২৫/৩০ বছর বাস করেও রেশান কার্ড করতে পারেনি। ভোটাধিকার পায়নি। বি,পি,এল হয়নি, অথচ এদের এখানে ওয় প্রজন্ম চলছে। এদের ভারত ছাড়া আর কোনও দেশ নেই। এখন প্রশ্ন— এই শরনার্থীরা কোন পর্যায়ের অনুপ্রবেশকারী ? ২০০৩ সনের নাগরিকত্ব আইন, বিচার বিভাগের নির্দেশ এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার শিকার কি গরীব উদ্বাস্তুরাই হবে। টাস্কফোর্স কি এদেরই ধরবে ?

**দেশ ভাগের জন্য পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুরা কি দুই দেশেরই বলি হবে ?**

## পনেরো

### আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের নিকট কী কী বক্তব্য রাখা উচিত?

আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমই স্বাধীনতা ও দেশ ভাগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সরকারকে বিবেচনা করা উচিত। ১৯৭১ সনকে Cut Off Year ধরতে হলে তার পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে, ১৯৭৫ সনে বাংলাদেশের চার জাতীয় নীতির অপমৃত্যু ঘটেছে এবং মুসলিম মৌলবাদী শাসন কায়েম হয়েছে। সরকারের জেনে রাখা উচিত, পূর্ব বাংলার নাম তিনবার পরিবর্তন হয়েছে, তাই বলে তিন বার মানুষ পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশ সৃষ্টির ৪ বছর পরই সংখ্যালঘুরা বিতাড়িত হচ্ছে, নাগরিকত্ব হারাচ্ছে। ১৯৫০ সনের জেনেভা সম্মেলনের উদ্বাস্তু সংগা সরকারের মেনে চলা উচিত। স্বাধীনতার প্রাক্কালে উদ্বাস্তুদের প্রতি জাতীয় নেতাদের প্রতিশ্রুতি মেনে নেওয়া জাতীয় কর্তব্য হিসাবে সরকারের বিবেচনা করা উচিত। বাংলার উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের সাথে সরকারের একই নীতি গ্রহণ করা উচিত। পাকিস্থানের উদ্বাস্তুরা এখনও ভারতে নাগরিকত্ব পাচ্ছে, বাঙালীরা নয় কেন? উদ্বাস্তু বিষয়ে একই দেশে দুই নীতি হতে পারে না। সুতরাং কোন সরকার বলতে পারে না যে, দেশভাগ এবং সাম্প্রদায়িকতার কারণে ১৯৭১ সনের আগে বা পরে ওপার বাংলা থেকে যারা বিতাড়িত হয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন তারা এখন আমাদের কেউ নন। যেহেতু জাতি এদের প্রতি চির প্রতিজ্ঞা বদ্ধ এবং স্বাধীনতার অসমাপ্ত কাজ। স্মরণ করতে হবে পণ্ডিত নেহেরুর কথা,—"সেখানে যাহাই ঘটুক না কেন, তারা আমাদের ভাই" অতএব বাংলাদেশ সৃষ্টি, উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের প্রশ্নে কোন বাঁধা হতে পারে না। বাঁধা তাদের জন্যই হতে পারে যারা ভারতের স্বার্থ ক্ষুন্ন করার জন্য অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে। যেহেতু তারাই প্রকৃত অনুপ্রবেশকারী। এবং যারা প্রকৃত অনুপ্রবেশকারী তাদের অনুপ্রবেশকারী বলতে কিসের বাঁধা, কিসের ভয়? মুসলমানরা ক্ষেপে যাবে?— যাক না—। ভোট দেবে না, না দিক, কিছু লোকের ভোটের জন্য জাতীয় স্বার্থ কখনও ক্ষুন্ন করা যায় না। বরং দেশের শত্রু চিহ্নিত হবে। তাই পরীক্ষাটা একবার হোক না, তাহলে তাদের আসল রূপটা ধরা পড়বে। ভারত সরকারের একটা যুক্তি হওয়া উচিত, তাহলো "ওপার বাংলা ৫ বার স্বাধীন হোক, সেখানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অভাব হলেও জাতীয় প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।" এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি বজায় থাকলে ওপার বাংলায় সংখ্যা লঘুরা নিরাপদে বাস করতে পারবে এবং অনুপ্রবেশ আসা বন্ধ হবে সাথে সাথে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় থাকবে। সরকারের বোঝা উচিত, উদ্বাস্তুরা সৃজনশীল এবং [illegible] শক্তি, কখনই ধ্বংসাত্মক শক্তি নয়।

## ষোল

### ২০০৩ সনের নাগরিকত্ব আইনের বিভিন্ন দিক—

পৃথিবীর যে কোন দেশই তাদের স্বার্থে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করতে পারে। এদেশের ১২৫ কোটি মানুষের স্বার্থ চিন্তা করে ভারতবর্ষ তার সংসদে নাগরিক আইন সংশোধন করেছে। সাথে সাথে দেশের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির কথাও সংসদ চিন্তা করেছে। এই আইন পাশের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মোট ৪৪ জন অভিজ্ঞ সাংসদ নিয়ে গঠিত স্থায়ী কমিটি, দীর্ঘ ৬ মাস বিলটি নিয়ে পর্যালোচনা করেন এবং ১২ ডিসেম্বর ২০০৩ সনে তাদের সুপারিশ সংসদে পেশ করেন। প্রথমে রাজ্য সভায় পরে লোকসভায় বিনা বিতর্কে আইনটি পাশ হয়। তবে খুবই লক্ষ্যনীয় যে, ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ৫৬ বছরের উভয় সভার ইতিহাসে এই প্রথম বিনা বিতর্কে একটি আইন পাশ হয়। অর্থাৎ সমস্ত রাজনৈতিক দল চোখ বুজে এই আইন সমর্থন করেছে।

এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তিনটি। যথা—

১) অনুপ্রবেশকারী প্রতিরোধ করা

২) প্রবাসী ভারতীয়দের দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রদান করা

৩) প্রত্যেক ভারতবাসীকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা

প্রথমটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য। দ্বিতীয়টি শিল্পে বিদেশী পুঁজি লগ্নী করার জন্য। তৃতীয়টি ভারতীয় ও বিদেশীদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য।

১) প্রথমেই দেশের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে অনুপ্রবেশকারী প্রতিরোধের জন্য আইন সংশোধন করে অবৈধ আগন্তুকদের Illegal Migrant বলে আখ্যায়িত করেছে। আর সংশোধনীর Sec. 2(1)b ধারায় লক্ষ লক্ষ অবৈধ আগন্তুকদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করতে চলেছে এবং কী কী কারণে কারা অনুপ্রবেশকারী তাও নাগরিকত্ব আইনে ২ টি ধারার বিশ্লেষণ করেছে। যেমন—

ক) যারা বৈধ পাশপোর্ট, বৈধ প্রমাণপত্র অথবা বৈধ অনুমতি ছাড়া ভারতে প্রবেশ করেছে, তারা অনুপ্রবেশকারী।

খ) বৈধ অনুমতিপত্র, বৈধ পাশপোর্ট অথবা তদসাপেক্ষ কোন অনুমতি পত্র নিয়ে ভারতে এসেছেন অথচ সময় অতিক্রম করার পর কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ভারতে বসবাস করছেন, তারা অনুপ্রবেশকারী।

সুতরাং হিন্দু মুসলমান যারাই অবৈধভাবে ভারতে এসেছেন তারাই অনুপ্রবেশকারী।

২) ২০০৩ সনের নাগরিকত্ব সংশোধনীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রদান। অর্থাৎ যে সকল ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিকত্ব নিয়েছে, তারা ইচ্ছা করলে ভারতীয় নাগরিকত্ব নিতে পারবেন। দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রদানের উদ্দেশ্য হল খুব সহজে বিদেশী পুঁজি ভারতে বিনিয়োগ করা। এক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ দেশের নাম আছে।

৩) এই নাগরিকত্ব সংশোধনীর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল "জাতীয় পরিচয়পত্র" প্রদান

করা অর্থাৎ ভারতে প্রত্যেক বৈধ নাগরিককে 'জাতীয় পরিচয়পত্র' প্রদান করা। এই পরিচয়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্য হল ভারতীয় নাগরিক এবং বিদেশী আগন্তুকদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা।

** সুতরাং দেশকে ভালবেসে বিচার করলে দেখা যায় যে ভারতের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য এটা প্রয়োজন, তবে দেশভাগের সমস্যাকে মাথায় রাখা উচিত ছিল।

** ২০০৩ সনের আইনে নাগরিকত্ব লাভের পদ্ধতি, ৬ নং পদ্ধতি নতুন।

২০০২ সন পর্যন্ত ভারতে ৫ টি পদ্ধতিতে নাগরিকত্ব প্রদান করা হত। কিন্তু ২০০৩ সন থেকে বিভিন্ন পাদ্ধতি সংশোধন করা হল এবং ৬ষ্ঠ পদ্ধতি চালু করা হল। যথা—

১. জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ (by birth)

২. নিবন্ধীকরণসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ (by registration)

৩. বিবাহসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ (by marriage)

৪. অবতরণ পদ্ধতিতে নাগরিকত্ব লাভ (by dicscent)

৫. সাধারণ পদ্ধতিতে নাগরিকত্ব লাভ (by naturalisation)

৬. দ্বৈতভাবে নাগরিকত্ব লাভ (overseas citizenship)

Illegal Migrant— অবৈধ আগন্তুক Section–2, Sub Section–(1)b

১. জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ : (by birth) sec.3, sub. sec.2

ক ) যারা ১৯৫০ সনে ২৬শে জানুয়ারী অথবা তারপর এবং ১৯৮৭ সনে ১লা জুলাইয়ের পুর্বে ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে, তারা ভারতে নাগরিকত্ব দাবী করতে পারবে।

খ) ১৯৮৭ সনের ১লা জুলাইয়ের পর কিন্তু ২০০৩ সনের ১৮ ই ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের পুর্বে যারা জন্মের সময় বাবা অথবা মা যে কোন একজন ভারতের নাগরিক ছিল, সে জন্ম সূত্রে ভারতে নাগরিকত্ব দাবি করতে পারবে।

গ) ২০০৩ সনে নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের পর যার পিতা মাতা উভয়ই ভারতের নাগরিক, সে জন্ম সুত্রে ভারতের নাগরিকত্ব দাবি করতে পারবে।

ঘ) যার পিতা অথবা মাতার মধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিক কিন্তু অন্য জন অনুপ্রবেশ কারী নন, তার প্রমান দিতে পারলে সে জন্ম সূত্রে ভারতীয় নাগরিকত্ব দাবি করতে পারবে।

যে ভারতীয় নাগরিকত্ব দাবি করতে পারবে না—

ক) যদি কারো পিতা বা মাতা বিদেশে কর্মরত অবস্থায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়ে [illegal] জেলে কারাবাস অবস্থায় জন্মগ্রহণ [illegible] তবে সে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব দাবি করতে পারবে না।

খ) কারও পিতা অথবা মাতা শত্রু দেশের লোক অথবা শত্রু দেশের কোনও পেশায় যদি নিয়োজিত থাকেন তাহলে সে নাগরিকত্ব দাবি করতে পারবে না।

২. নিবন্ধন সূত্রে নাগরিকত্বে লাভঃ (by registration) section–5(1)

এই ধারায় বেশ কিছু বিষয়ে— প্রতি সুবিধা, শর্তাবলী এবং বাধাগুলি নির্দেশিত আছে। আবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগত নাগরিকত্বহীন ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব নিবন্ধীকরণের জন্য সংবিধান অনুযায়ী আবেদন পত্রের উপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নিবন্ধন করে দিতে পারেন যদি ঐ ব্যক্তি অনুপ্রবেশকারী বা অবৈধ আগন্তুক না হন এবং নিম্নলিখিত শর্তভিত্তিক হন। যেমন—

(a) "A person of indian origin who are ordinarily resident in India for seven years before making an application for registration citizenship act– 5(1)c "

(এখানেই শর্তের মধ্যে— গোলমাল, যেহেতু যিনি Indian Origin এবং ৭ বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, তার নাগরিকত্ব নিবন্ধনের কোন প্রশ্ন আসে না।)

(b) যিনি অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ভারতে বৈধভাবে এসে ৭ বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তিনি নাগরিকত্বের জন্য নিবন্ধন সূত্রে দাবি করতে পারেন।

এছাড়া যে ব্যক্তি বৈধভাবে ভারতে এসে বৈধভাবে ৭ বছর স্থায়ী রূপে বসবাস করছেন এবং ভারতের শত্রু দেশের কোনও শত্রু দেশের নাগরিক নন, তিনিও নাগরিকত্বের জন্য নিবন্ধন সূত্রে আবেদন করতে পারেন।

৩. বিবাহ সূত্রে নিবন্ধীকরণ : (by marriage) section–5(1)c

যে ব্যক্তি কোনও ভারতীয় নাগরিককে পুরুষ/মহিলা বিয়ে করে ৭ বছর ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তিনি নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে তিনি অবৈধ আগন্তুক নন বলে প্রমাণিত হবেন।

৪. বংশধারা সূত্রে নাগরিকত্ব : (by descent) section–4

কোনও ভারতীয় নাগরিক বিদেশের মাটিতে কোনও সন্তান জন্ম দিলে সেই সন্তান ভারতে এসে নির্দিষ্ট শর্তাবলী সাপেক্ষ ভারতে নাগরিকত্ব দাবি করতে পারেন অর্থাৎ যেদেশে জন্মগ্রহণ করেছে, প্রথমে সেদেশের নিকটস্থ ভারতীয় দূতাবাসকে জানাতে হবে।

৫. সাধারণ পদ্ধতিতে নাগরিকত্ব : (by naturalisation) section – 6(1)

কোনও বিদেশী যদি ভারতে সরকারী, আধা-সরকারী বা সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থায় বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন পদে যেমন— কলা, দর্শন, সাহিত্য বিজ্ঞান বা মানবিক কল্যাণকর কোন বৃহৎ কর্মপদে ১১ বছর নিয়োজিত থাকেন তবে তিনি এই ধারায় ভারতীয় নাগরিকত্ব দাবী করতে পারেন, কিন্তু তৎপূর্বে তিনি অনুপ্রবেশকারী নন এবং কোন দেশের নাগরিক নন তাকে তা প্রমাণ করতে হবে।

৬. দ্বৈত নাগরিকত্ব : (Overseas Citizenship), Section–7A (1)

দ্বৈত নাগরিকত্ব কী এবং কেন, সে বিশ্লেষণ আগে করা হয়েছে। এই সকল প্রবাসী ভারতীয় বিদেশে নাগরিকত্ব নিয়ে বসবাস করে, সমস্ত শর্ত সাপেক্ষে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারবেন। এই সুযোগ বিশ্বে মাত্র ১৬টি দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং তার অধিকাংশই শিল্পোন্নত দেশ, তবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বাদ।

*** বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশীয়দের জন্য নাগরিকত্ব প্রদান ১৯৭১ সনেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং তার পর ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সনে বিভিন্ন আইন সংশোধনের মাধ্যমে ২০০৩ সনে একটা চূড়ান্ত পরিনতি লাভ করে। ১৯৭৮ সনে "পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কল্যান পরিষদ" এবং পরবর্তী কালে "বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যান পরিষদ" যে আন্দোলন শুরু করেছিল, সেই আন্দোলনকে তীব্রতর করতে পারলে ১৯৮৭ সনে এই ভাবে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন হত না। এবং ২০০৩ সনে এ ভাবে কোন বিল সংসদে পেশ হত না। এই সময় আন্দোলনে যারা সহযোগিতা করেনি, তারা ও এ জন্য অনেকটা দায়ী। এখন সময় অনেক পেরিয়ে গিয়েছে।

পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের দুর্গতির জন্য তারা নিজেরাও অনেকটা দায়ী।

## সতেরো

### ১৯৭১ সনের পর বাংলায় উদ্বাস্তু আন্দোলনের ইতিহাস

১৯৫০ সনের পর ১৯৭৭ সন পর্যন্ত অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত UCRC-র নেতৃত্বে বাংলায় উদ্বাস্তু আন্দোলন সচল ছিল। কিন্তু তারা ক্ষমতায় আসার পরই তাদের নেতৃত্বে উদ্বাস্তু আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। পরে যতটুকু আন্দোলন চলেছে, তা নাম মাত্র। তবে তাদের আন্দোলন ছিল ১৯৭১ সনের পরে আসা উদ্বাস্তুদের নিয়ে নয়, শুধু মাত্র ১৯৭০ সন পর্যন্ত আগত উদ্বাস্তুদের নিয়ে। এমন কি ১৯৭১ সনের পরে আসা উদ্বাস্তুদের আন্দোলন নিয়ে এরা সরাসরি বিরোধিতা করত। যেহেতু এরা নাগরিকত্ব আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল।

১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের "শরণার্থী" বলা হত। এই শরণার্থীরাও পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তারা দেশে ফিরে যায়।

অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে এখানে উদ্বাস্তু হয়ে বসবাস করার ইচ্ছা তাদের ছিল না।

১৯৭৩-১৯৭৫ সনে বাংলাদেশ সরকার নিয়ন্ত্রিত রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারে হিন্দু যুবকেরা ভারতে চলে আসতে শুরু করে। কারণ শিক্ষিত যুবকেরা তাদের নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চিৎ ভেবেই ভারতে চলে আসে। এভাবে ১৯৭১ সনের পর প্রথম উদ্বাস্তু আগমন শুরু।

১৯৭৫ সনে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের পতন ঘটে এবং পাকিস্থানপন্থী মুসলিম মৌলবাদী সরকার ক্ষমতা দখল করে। তারপর থেকেই তারা সংখ্যালঘুদের উপর যথারীতি অত্যাচার শুরু করে এবং বাংলাদেশ থেকে আবার তাড়াতে আরম্ভ করে, ফলে সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৪ বছর পরই ভারতে আশ্রয় নিয়ে অস্বীকৃত ভাবে এখানে সেখানে উদ্বাস্তু জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ভারত সরকার এই বিতাড়ন

সম্পার্কে কোন প্রতিবাদ করেনি বা উদ্বাস্তু সম্পর্কে কোন মানবতা দেখায়নি, সব সময় নীরব ভূমিকা পালন করেছে।

এই নীরবতার জন্যই সেখানে সংখ্যালঘুর উপরে অত্যাচার কমে না, বিতাড়নও কমে না, আগমনও কমে না এবং উদ্বাস্তু সমস্যাও কমে না। এটাই বাস্তব সত্য।

সুতরাং এই নীরবতা এবং উদাসীনতার কারণে পুরানো উদ্বাস্তু সমস্যার সাথে পশ্চিম বাংলায় নতুন মাত্রা যোগ হল, অনুপ্রবেশকারী ও সন্ত্রাসবাদী। এ ছাড়া আছে মাওবাদের মতন আভ্যন্তরীন সন্ত্রাসবাদ। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খুবই ভয়াবহ। গত ২৮/১২/২০১৩ তারিখ মতুয়া মহা সংঘের নেতৃত্বে লক্ষাধিক লোকের ঐতিহাসিক উদ্বাস্তু সমাবেশ আর একবার প্রমাণ করল যে, এ রাজ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা কত প্রকট। এই সমস্যা সমাধানের জন্য যারা আন্দোলন করেছে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দেওয়া হল—

১) উদ্বাস্তু সহায়ক সমিতি—

এই নতুন সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবাংলায় ১৯৭৪ সনে প্রথম আন্দোলন শুরু করেন নদীয়া জেলার বাসিন্দা শ্রী মদনমোহন ঘোষ। এই সংগঠনের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তার আন্দোলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি।

২) পূর্ববঙ্গ সংখ্যা লঘু কল্যাণ পরিষদ গঠন—

১৯৭৮ সনে বাংলাদেশীদের ধরার জন্য সরকার টাস্ক ফোর্স গঠন করে এবং বাংলাদেশীদের পুশব্যাক শুরু করে। এই পুশব্যাকের প্রতিবাদে ওই সনে ভবানীপুর ২১নং ডাঃ রাজেন্দ্র রোডের বাড়িতে 'পূর্ববঙ্গ সংখ্যা লঘু কল্যাণ পরিষদ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়, যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাবু চিত্তরঞ্জন সুতার, যিনি ১৯৭১ সনে স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তব রূপকার ছিলেন। এই পরিষদের তিনি ছিলেন অনন্য বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্। তখন পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কল্যাণ পরিষদের নেতৃত্বে বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের অধিকার আদায়ের জন্য বহু প্রবীণ ব্যক্তিত্ব উদ্বাস্তু আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন। যেমন - বাবু সুশীল কুমার ঘোষ, বাবু অজিত সেনগুপ্ত, বাবু হীরালাল মজুমদার, শ্রদ্ধেয়া শৈলবালা দে, বাবু সুরেন রায় চৌধুরী প্রমুখ। এখন সবাই মৃত। এছাড়া ছিলেন অনেক বিদ্বজ্জন ও সমাজসেবী সংগ্রামী ও ত্যাগী মানুষ। যেমন- বাবু [illegible] (মৃত), বাবু অগ্নিকুমার মিস্ত্রী (মৃত), বাবু বিপদভঞ্জন বিশ্বাস (মৃত), বাবু [illegible] মণ্ডল (মৃত), শ্রীহরিপদ সিকদার, শ্রী কর্ণধর বিশ্বাস, শ্রী নির্মলেন্দু দাস, বাবু [illegible] (মৃত), শ্রী রত্নেশ্বর সরকার (এডভোকেট), শ্রী প্রদীপ রায় চৌধুরী, শ্রী [illegible], শ্রী সুশান্ত সাহা, শ্রী অমলেন্দু বিশ্বাস, শ্রী করুণাময় হালদার, শ্রী [illegible], শ্রী জগদীশ চন্দ্র হালদার, শ্রী প্রবোধ চক্রবর্ত্তী এবং আরও অনেকে। এছাড়া ছিল, একটি আদর্শের কিছু সৎ, নিষ্ঠাবান ও আত্মত্যাগী যুবক। ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের বহু নেতৃত্ব। সব মিলিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন ছিল যা

বহু রাজনৈতিক দলেরও ছিল না। তখন আন্দোলনের জন্য 'পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কল্যাণ পরিষদ' কলকাতার বুকে বহু সমাবেশ করেছিল। ১৯৮২ সনে শহিদ মিনারের সমাবেশে ২০/২৫ হাজার উদ্বাস্তু টাস্কফোর্সের বিরুদ্ধে বজ্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলে রাজধানী কাঁপিয়ে তুলেছিল। ফলে সরকার টাস্কফোর্স তুলে নিতে বাধ্য হয়। এই সংগঠন দেশভাগের সময় জাতীয় নেতাদের প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করে এবং বহু ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে সর্বপ্রথম '<u>ঐতিহাসিক অধিকার</u>' নামে একটি অতি মূল্যবান পুস্তিকা প্রকাশ করে, যার মধ্যে উদ্বাস্তুদের অধিকার সম্পর্কে তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক অনেক যুক্তি আছে।

** পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য ১৯৭১ সনের 'ভিত্তিবর্ষ' cut off year তুলে দেবার জন্য এই সংগঠন সর্বপ্রথম আওয়াজ তুলেছে। এছাড়া তখন প্রায় ৫৫ হাজার উদ্বাস্তুদের জন্য এই সময় নীল রংয়ের কার্ড করা হয়েছিল।

৩) নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ বনাম হোমল্যান্ড আন্দোলন—

১৯৭১ সনে পূর্ব- পাকিস্থানের শরণার্থীদের ভারতে রাখার জন্য এই সংগঠন গড়ে তোলা হয়। কিন্তু ভারত সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের চাপে এই সংগঠন নীতিচ্যুত হয়। ১৯৭৭/৭৮ সনে পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কল্যাণ পরিষদের উদ্বাস্তু আন্দোলনের বিরুদ্ধে এরা Home land আন্দোলন শুরু করে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের জন্য বাংলাদেশের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে ৬টি জেলা নিয়ে একটি স্বাধীন দেশের (বঙ্গভূমি) আন্দোলন শুরু করে। দাবিটি বহিদৃষ্টিতে শুনতে কিছু লোকের জন্য খুব ভালই লাগে, কিন্তু অন্তঃদৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে ১০০ শতাংশ অবাস্তব। কারণ—

১) একটি দেশ স্বাধীন হতে যে ৪ টি একান্ত বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, যেমন— (ক) জনসমষ্টি, (খ) নির্দিষ্ট ভুখন্ড, (গ) সার্বভৌমত্ব (ঘ) সরকার। যার প্রথম বৈশিষ্ট হল 'জনসমষ্টি'। অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট ভূখন্ডের অধিকাংশ জনসমষ্টির সমর্থন থাকা চাই, এটাই নিত্য সত্য। কিন্তু এই ভূখন্ডের ৮০ শতাংশে জনসংখ্যা বিরুদ্ধে।

২) ভারত কর্তৃক সদ্য সৃষ্ট একটি স্বাধীন দেশকে বিভক্ত করতে ভারত কিছুতেই রাজী হবে না। সুতরাং ভারতের গায়ে ভারতের সহযোগিতা ছাড়া আর একটা দেশ স্বাধীন হবে, তা অস্থির মস্তিকের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩) বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগণই এর বিরোধিতা করে।

৪) এভাবে Home land আন্দোলন বাংলাদেশের মুসলিম মৌলবাদের হাত [illegible] এবং বাংলাদেশের বসবাসরত হিন্দুদের ক্ষতি করে, সাথে সাথে উদ্বাস্তু [illegible]রও ক্ষতি করে। অপরদিকে ভারতে আর একটা মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের পথ সুগম করা হবে। সুতরাং Home land আন্দোলন উদ্বাস্তু আন্দোলনের চরম ক্ষতিকারক।

### ৪) বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ—

১৯৮৮ সনে পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কল্যাণ পরিষদ ভেঙ্গে যায় এবং "বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ" গঠিত হয়। বাবু চিত্তরঞ্জন সুতার এই নতুন সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অবশ্য কয়েকজন সদস্য পুরানো সংগঠনকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তবে অধিকাংশ সদস্য নতুন সংগঠনকে সমর্থন করেছিলেন। সাথে সাথে আঞ্চলিক সংগঠনগুলিও নতুন সংগঠনকে সমর্থন করেছে। অল্প দিনের মধ্যে এই সংগঠন সমগ্র বাংলায় ৩৮৭টি আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলে। ১৯৮৮-১৯৯০ সনের মধ্যে এই সংগঠন কলকাতার রাজপথে ৬০/৭০ হাজার উদ্বাস্তু, ১৯৮৭ সালের নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করে। এছাড়া এই সংগঠন একটি ঐতিহাসিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। যেমন — ১৯৮৮ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে এসপ্লানেড ইস্টে প্রত্যেক দিন ১০০ লোকের ধারাবাহিক ৩০ দিন অনশন করেছিল যা এই উপমহাদেশে আর কখনও হয় নি। এই সংগঠন ১২ লক্ষ উদ্বাস্তুদের তালিকা তৈরী করে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাস এবং বাংলাদেশ মিশনে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশ মিশনই এই তালিকা গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশী ষড়যন্ত্র তখনই স্পষ্ট হয়েছে এবং ভারত সরকারের অনিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে।

### ৫) মোহাজির সংঘ গঠন—

কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ এক উদ্বাস্তুঘাতী চক্রান্তে লিপ্ত হয়। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের একটা অংশের চক্রান্তে ২১নং রাজেন্দ্র রোডের বাড়িতে শ্রী চিত্তরঞ্জন সুতারের সহযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্বের দাবিতে '<u>মোহাজির সংঘ</u>' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। এই সংগঠন ১২/২/১৯৯১ তাং ভারতে নাগরিকত্বের দাবিতে প্রেস কনফারেন্স ও ধর্মতলায় প্রকাশ্য সমাবেশ করে এবং পরের দিন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। উল্লেখ করা ভাল যে, ঐ অর্থলোলুপ হীনষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আমি বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ ত্যাগ করি। <u>পূর্ব বাংলার নমশূদ্র নেতৃত্ব ক্ষমতা বা অর্থের লোভে বারে বারে জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।</u> ইচ্ছাকৃত কারো নাম আমি প্রকাশ করলাম না। মোহাজির সংঘের প্রকাশ্য সমাবেশের পর ভারত সরকার আইন ও নীতি অনুযায়ী বিপদে পড়েছে। যেহেতু বাংলাদেশী হিন্দু সংখ্যালঘু— উদ্বাস্তু সম্পর্কে তারা আর পৃথক করে ভাবতে পারছে না। কারণ উদ্বাস্তুরাও অবৈধ আগন্তুক এবং ভারত সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার বেড়াজালের ফাঁদে পড়েছে। <u>তাই তখন থেকে প্রকৃত উদ্বাস্তুরাও- 'অনুপ্রবেশকারী' হয়ে গেল।</u> স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সাথে আলোচনা করে ১৯৯১ সনে তা বুঝতে পেরেছি। তাই উদ্বাস্তুদের অনুপ্রবেশকারী হিসাবে আখ্যায়িত হওয়ার বিরুদ্ধে ১৯৯২ সনে "<u>পূর্ব ভারত মানবাধিকার সুরক্ষা সমিতি</u>" গঠন করি। কিন্তু অর্থাভাবে সে আন্দোলন সফল করতে পারিনি, সংগঠনও রক্ষা পায়নি। অপর দিকে বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদেরও অবলুপ্তি ঘটে।

### ৬) সংযুক্ত উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ গঠন—

বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের বিচ্ছিন্ন হওয়া নেতৃবৃন্দ ১৯৯৬ সনে স্বরূপনগর, উঃ ২৪ পরগণা জেলায় বিমল মজুমদারের চেষ্টায় উদ্বাস্তু আন্দোলনের নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং "সংযুক্ত উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ" নামে একটি সংগঠন গঠন করে। এই সংগঠন অগ্রগতিও লাভ করে। কিন্তু ৩০ বছর উদ্বাস্তু আন্দোলন করে আমার ধারণা হয়েছে যে, বাংলাদেশী উদ্বাস্তুরা খুব নিচু মানের। তারা কলহপ্রিয়, স্বার্থপর, বিভেদকামী, নিজেদের ভাল নিজেরা বোঝে না, বুঝতেও চায় না — ক্ষণিকের স্বার্থের পিছনে ছোটে ইত্যাদি। নেতারা আরও ভয়াবহ। নিজেদের যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন নয়, অথচ সব সময় নেতা হবার লোভ। এক একজন নেতা এক একটা কমিটি করে তার নেতা হয়। ফলে উদ্বাস্তু সংগঠনগুলো বারে বারে ভেঙে যায়। তাই সরকার কোন উদ্বাস্তু আন্দোলনে গুরুত্ব দেয় না। এই নেতৃত্বের দ্বন্দেই সংযুক্ত উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ ভেঙে যায়। এতসব বিভেদের মধ্যেও আন্দোলন করে যেতাম।

### ৭) উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ গঠন—

সংযুক্ত উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদের অধিকাংশ সদস্য সহমত পোষণ করে সংযুক্ত শব্দ বাদ দিয়ে "উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করে ২০০১ সনে। ধীরে ধীরে এই পরিষদে বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী যোগদান করেন। ফলে সাংগঠনিক পরিকাঠামো বৃদ্ধি পায় এবং আন্দোলনের নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই সংগঠনকে যে কয়জন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বুদ্ধিজীবী সমৃদ্ধ করেছেন তারা হলেন * হীরালাল দাস রায়(স্বাধীনতা সংগ্রামী) * সুরেন রায় চৌধুরী (স্বাধীনতা সংগ্রামী) * তুলসী চরণ ঘোষ (CPI নেতা) , * রণজিত সিকদার(বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ), *অমল বিশ্বাস (বিশিষ্ট সমাজসেবী) *সুধাংশু মজুমদার (বিশিষ্ট সমাজসেবী) শ্রী রত্নেশ্বর সরকার (এডভোকেট) শ্রী কর্ণ ধর বিশ্বাস (কংগ্রেস নেতা) শ্রী আদিত্য কুমার রায় (বিশিষ্ট সমাজসেবী) শ্রী জীবন কৃষ্ণ মজুমদার(বিশিষ্ট সমাজসেবী) শ্রী প্রদীপ হোম চৌধুরী (বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ) শ্রী সুধীর রঞ্জন হালদার (বিশিষ্ট সমাজ সেবী) , শ্রী সুবোধ চন্দ্র সমাদ্দার (বিশিষ্ট সমাজসেবী) শ্রী অমূল্য ব্রহ্ম (কংগ্রেস নেতা) শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস (প্রকাশক, দেশভাগের যন্ত্রণা) এছাড়া যারা দীর্ঘদিন উদ্বাস্তু আন্দোলন করেছে তারা হলেন, শ্রী মণীন্দ্র সমাদ্দার (সাধারণ সম্পাদক), অমল বিশ্বাস, জগদীশ হালদার, সুকুমার সিকদার, হিমাংশু বিশ্বাস, পিযুষ কুন্ডু, দিনেশ মজুমদার, প্রবোধ চক্রবর্তী, করুণাময় হালদার, শ্রীমতি উষা মজুমদার এবং আরও অনেকে।

২০০৩ সনের নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ সবার আগে আন্দোলন শুরু করে। উদ্বাস্তুদের সচেতন করার জন্য এই সংগঠন জেলায় জেলায়, অঞ্চলে অঞ্চলে বেশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই সংগ্রাম পরিষদ কলকাতার বুকে ২০০১ সন থেকে জনসভা, গণ অবস্থান, গণ কনভেনশন, ডেপুটেশন, স্মারকলিপি প্রদান,

পত্রিকা প্রকাশ, পুস্তিকা প্রকাশ সবই হয়েছে। অবশেষে আরও বৃহত্তর আন্দোলন করার জন্য এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী উপেন বিশ্বাস (IPS) এর সহযোগিতায় তার বাড়িতে ২০০৪ সনে... কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্বাস্তু সংগঠন এবং সামাজিক সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে All India Refugee Front গঠন করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় কয়েক মাসের মধ্যে কিছু লোক এই ফ্রন্ট ভেঙে ফেলে এবং নিয়মনীতি বহির্ভূত 'ফ্রন্ট' নাম নিয়ে একটি একক সংগঠন হিসাবে কমিটি গঠন করে সেই সংগঠন পরিচালনা করে। অপরদিকে মূল সংগঠন উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ তার নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে। এই দুই সংগঠন তারপর আর কোলকাতায় কোনও বড় আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি। আঞ্চলিক সভা, অফিসিয়াল যোগাযোগ আর নেতাদের সাথে সাক্ষাত, এই সমস্ত কর্ম-সূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে আরও কতগুলি ছোট ছোট উদ্বাস্তু সংগঠন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সৃষ্টি হয় এবং এই বিভাজনের ফলে উদ্বাস্তু আন্দোলন অনেক ক্ষতি হল। তবুও কিছু কিছু লোক দীর্ঘদিন ধরে নিরলস ভাবে এখনও উদ্বাস্তু আন্দোলন করে যাচ্ছেন যেমন, ১৯৮০ সন থেকে ২০১১ সন পর্যন্ত ৩১ বছর ধরে যারা আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, তারা হলেন—

** <u>[illegible] রাজেশ্বর সরকার (এডভোকেট) কর্ণধর বিশ্বাস, নির্মল দাস, প্রদীপ হোম চৌধুরী, মণীন্দ্র সমাদ্দার, চিন্ময় গোলদার, সুশান্ত সাহা, অমল বিশ্বাস, জগদীশ হালদার, প্রবোধ চক্রবর্তী, বিমল মজুমদার, সুকুমার সিকদার।</u>

**নাগরিকত্ব আইন সম্পর্কে নোটিশ জারি— ০৭/০৫/২০০৩**

**নাগরিকত্ব আইন সংশোধন—১৮/১২/২০০৩**

**নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনের ধারা—**

**(ক) স্মারকলিপি প্রদান**

| দপ্তর | | তাং |
|---|---|---|
| ১. রাষ্ট্রপতি | - | ১১/০৪/০৩, ১০/১০/০৩<br>২৪/১২/০৩, ০৩/০৮/০৮ |
| ২. প্রধানমন্ত্রী- অটল বিহারী | - | ১৪/১১/০২, ২১/০৪/০৩<br>১০/১০/০৩ |
| ৩. প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং | - | ১১/১২/০৯ |
| ৪. কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী | - | ১৪/১১/০২, ২১/০৪/০৩<br>১০/১০/০৩, ০৩/০৮/০৪ |
| ৫. শ্রীমতি সনিয়া গান্ধী | - | ০৬/১১/০২, ১০/১০/০৩ |
| ৬. রাজ্যপাল (পঃ বঃ) | - | ২২/১১/০১, ১১/১২/০২<br>২১/০৪/০৩, ১৬/১২/০৫ |

৭. মুখ্যমন্ত্রী (পঃ বঃ) - ২৭/০৬/০১, ১৮/১২/০১
১৭/০৬/০৬, ২১/০৪/০৬

৮. শ্রী প্রণব মুখার্জী (মন্ত্রী) - ০৬/০৬/০৩, ২৪/১১/০৩, ১৫/১২/০৩

৯. মিঃ তপন চ্যাটার্জী (এম. পি.) - ৩০/০৬/০৩
(স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য)

১০. শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জী - ১৩/১০/২০০৩
তৃণমূল (কং)

১১. স্বরাষ্ট্র-সচিবালয় (মহাকরণ) - ১৩/১০/০৩

১২. উপরাষ্ট্রদূত (বাংলাদেশ) - ২০/১২/০১

সরকার বিজ্ঞপ্তি জারী করার সাথে সাথে এই সংগঠনই সর্বপ্রথম হাজার হাজার প্রচার পত্র বিলি করে সকল বাঙালীকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানায়।

(খ) জনসভা

| তাং | কর্মসূচী | স্থান | বক্তা ও অতিথি |
|---|---|---|---|
| ২১/০৪/০৩ | গণঅবস্থান | গান্ধীমূর্তি পাদদেশ | মিঃ পঙ্কজ ব্যানার্জী তৃণমূল(কং) মিঃ প্রদীপ ভট্টাচার্য (কংগ্রেস) |
| ১৩/৯/০৩ | নাগরিক কনভেনশন | [illegible]নাথ কলেজ ([illegible]দহ) | ১৩ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী মিঃ তথাগত রায় (বি.জে.পি) |
| ১৮/১১/০৩ | গণকনভেনশন | | শহিদ মিনার (কলকাতা) সংগঠনের নেতৃবৃন্দ |
| ১৭/০২/০৫ | যৌথ গণঅবস্থান | [illegible] | সংগঠনের নেতৃবৃন্দ |
| ১৬/১২/০৫ | বিজয় দিবসে মহিলা ধর্ণা | [illegible] | মিঃ তথাগত রায় (বি.জে.পি) সংগঠনের নেতৃবৃন্দ |
| [illegible] | নদীয়া জেলা সম্মেলন | বাদকুল্লা | সংগঠনের নেতৃবৃন্দ |
| [illegible] | আন্তর্জাতিক শরনার্থী [illegible] উদ্বাস্তু [illegible] দাবি পেশ [illegible] | ভারত সভা হল | মিঃ দেবব্রত বিশ্বাস সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (ফরওয়ার্ড ব্লক) মিঃ হরিপদ বিশ্বাস (এম.এল.এ) |

ভারতে আশ্রয় নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে এবং চিন্তা চেতনায় যারা ভারতের মঙ্গল কামনা করে, শুধুমাত্র তাদেরই ভারতীয় বলে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত।

৩) এই সংগঠন মনে করে উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশকারী দুটি পৃথক সত্ত্বা, পৃথক পরিচয়, পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী। প্রথম শ্রেণীর দেশপ্রেমিক শক্তি দ্বিতীয় শ্রেণী দেশবিরোধী শক্তি। তাই সরকারের উচিত পৃথকভাবে চিহ্নিত করা এবং পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং UNHCR-এর ৪২৮ ধারা কার্যকর করা।

৪) এই সংগঠন মনে করে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তা, আত্মসম্মান এবং গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে সু-নাগরিক হিসেবে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করুক।

৫) বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি আবার কোনও সুযোগ পাক এমন কোন কাজ এই সংগঠন সমর্থন করে না বরং বাংলাদেশের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার সাথে সর্বদা সহমত পোষণ করে।

৬) এই সংগঠন দুই বাংলার যৌথ সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী, কারণ এরা মনে করে যে সমগ্র উপমহাদেশে বাঙালী সংস্কৃতি এবং সমগ্র বিশ্বে বাংলাভাষা প্রাধান্য পাক।

৭) দুই বাংলায় আর কোনও বিভাজন হোক, এই সংগঠন আর বিশ্বাসী নয়।

৮) এই সংগঠন মনে করে ভারত বাংলাদেশের মৈত্রী দীর্ঘস্থায়ী হোক, কিন্তু মিথ্যার সাথে আপোষ করে নয় বা মৈত্রী একতরফা না হয়।

৯) এই সংগঠন সামাজিক বৈষম্য এবং ধর্মীয় মৌলবাদকে সমর্থন করে না, কারণ হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মীয় মৌলবাদ ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থাকে শতধা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তেমনি ধর্মীয় মৌলবাদ ৬০০ খৃঃ থেকে আরম্ভ করে মধ্য এশিয়া থেকে সমগ্র বিশ্বকে রক্তস্নাত করেছে। আবার কোন কোন মৌলবাদ দুঃসাহস করে আত্মরক্ষার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং ধর্মীয় মৌলবাদ মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে।

১০) এই সংগঠন সন্ত্রাসবাদ বা বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করে না। দরিদ্রমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী ভারতবর্ষ এই সংগঠন কামনা করে।

## ৮. অল ইন্ডিয়া রিফিউজী ফ্রন্টের গঠন ও ভূমিকা

এই সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদের একটা বিশেষ অংশকে নিয়ে। ফ্রন্ট নাম হলেও ফ্রন্টের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন নেই। এটি ফ্রন্ট নামে একক সংগঠন। তবে তারা আন্দোলনের গতি অনেকটা সচল রেখেছেন। বিভিন্ন দপ্তরে তারা স্মারক লিপি প্রদান করেছেন। রাজ্য ও দিল্লীতে তারা বহু নেতৃত্বের সাথে সাক্ষাত করেছেন। এছাড়া তারা

এই ধর্মের লোকরা ভীষণ ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাবে কোনও আন্দোলন [illegible] করেন না, যেহেতু শান্তি ও ভালবাসাই তাদের মূলমন্ত্র এবং ধর্মীয় পরিমণ্ডলে এরা থাকতে [illegible] ভালবাসে।

১৯৭৮ সনে ভারত সরকার বাংলাদেশী অবৈধ উদ্বাস্তুদের ধরার জন্য টাস্কফোর্স গঠন করে এবং তাদের ধরে ধরে পুশব্যাক শুরু করে। এই সময় টাস্কফোর্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য 'পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কল্যাণ পরিষদ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয় এবং জোড় আন্দোলন শুরু করে। তখন মতুয়া মহাসংঘের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা সহযোগিতা করেনি। ১৯৮২ সনে কলকাতার বুকে বিরাট উদ্বাস্তু সমাবেশ হয়, তখনও মতুয়া মহাসংঘ কোনও সহযোগিতা করে নি। ১৯৯৮ সনে বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ উদ্বাস্তুদের স্বার্থে যখন এক মাস এসপ্লানেড-ইস্টে রিলে অনশন করে তখনও মতুয়া মহাসংঘ অনশনে অংশগ্রহণ করে নি। ২০০৩ সনে যখন কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করার বিজ্ঞপ্তি জারি করে, তখন সর্বপ্রথম 'উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ' এই বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে এবং সংগ্রামের সমর্থনের জন্য ঠাকুর বাড়ির কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল। তাদের সমর্থনের জন্য সংগঠনের পক্ষে অ্যাডভোকেট রত্নেশ্বর সরকার, আমি, জগদীশ হালদার এবং আরও তিনজন গিয়েছিলাম— কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তখনও উপেক্ষিত হয়েছিলাম। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ২০১০ সনে মতুয়াদের সাথে উদ্বাস্তু আন্দোলনে যারা অত্যুৎসাহ দেখিয়েছেন, কিছুদিন আগেও তারা উদ্বাস্তু আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে সমালোচনা করেছেন। ১৯৭১ থেকে ১৯৮৬ সন পর্যন্ত একটা সরকারী নোটিশ, ১৯৮৬-২০০৪ পর্যন্ত বিভিন্ন আইন জগদ্দল পাথরের মতন উদ্বাস্তুদের উপর চেপে বসে আছে, অথচ ৩৩ বছরে মতুয়া মহাসংঘ বা ঠাকুরবাড়ির কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত ধর্মগুলি হচ্ছে এক একটি ভাববাদী দর্শন এবং একটি অতি স্পর্শকাতর পরিমণ্ডল। এই ভাববাদ এবং স্পর্শকাতরতাকে পাথেয় করে ধর্মগুরুরা যুগ যুগ ধরে সমগ্র বিশ্বকে উত্তেজিত করেছে, এর সাথে আছে অর্থলোলুপতা। ধর্মগুরুরা দুই শত বছর ক্রুসেডের যুদ্ধ করেছে, এই ধর্ম হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থাকে শতধা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, এই ধর্ম ভারতবর্ষকে তিন টুকরো করেছে। এই ধর্ম ভারতবর্ষের কয়েক কোটি মানুষকে উদ্বাস্তু করে রেখেছে। আবার ব্যতিক্রমও আছে। গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীর বুকে শান্তির বাণী ছড়িয়েছেন, বিবেকানন্দ শিক্ষার আলোক সংস্কার এনেছেন, গুরু চাঁদ ঠাকুর দলিত মানুষকে সচেতন হতে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু জড়তা ও অন্ধ কোন [illegible] থেকে মানুষকে মুক্ত করতে ধর্মদর্শনগুলি পুরোপুরি সফল হয় নি।

১৯ শতকের [illegible] মতুয়া ধর্মের প্রকাশের [illegible] বাস্তবতা ছিল, মহত্ত্ব ছিল, বিশ্ব মানবতা ছিল, [illegible] গতি ছিল, — ছিল না [illegible], ছিল না [illegible]। কিন্তু [illegible] শতাব্দীতে এই ধর্ম [illegible] গিয়ে ভাববাদ ও অন্ধবাদে পরিপুষ্ট হয়। একসময় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যই ছিল মতুয়া ধর্মের মূলমন্ত্র। সামগ্রিক ভাবে মতুয়া মহাসংঘ রাজনীতির [illegible]

ছিল। 'যার দল নাই, তার বল নাই' কথার অর্থ ছিল দলিতদের মধ্যে ঐক্য, শৃঙ্খলা, সৈকত্য, সংহতি ও ভালবাসা স্থাপন করা, সর্বোপরি তাদের আধুনিক করে গড়ে তোলা। দলিত মানুষদের শিক্ষিত করার জন্য, তাদের চেতনা বৃদ্ধির জন্য 'খাও বা না খাও সন্তানদের পড়াশুনা করাও', এই অমোঘ বাণীটি গুরুচাঁদ ঠাকুর দিয়েছিলেন। শিক্ষা চেতনা বাড়ায় এবং চেতনা বিচার শক্তি বাড়ায়। কিন্তু মতুয়াদের বিচার শক্তি বাড়ার পরিবর্তে বেড়েছে রক্ষণশীলতা। ভারতবর্ষে ঠাকুরনগরের 'মতুয়া ধাম' মতুয়াদের সর্বোভারতীয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। সুতরাং সেখানের নির্দেশ অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তারা তা মেনেও চলে।

১৫/১২/২০০৪ তাং ঠাকুর বাড়ির নির্দেশে মতুয়া ভক্তরা মতুয়াদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে ঠাকুরবাড়ির মন্দিরের সামনে অনশনে বসেন। ঠাকুরবাড়ির নির্দেশ, ঠাকুরবাড়িতে অনশন, ঠাকুরবাড়ির জন্য অনশন, সুতরাং মতুয়া ভক্তরা ভাবে আপ্লুত হয়ে অনশনে ছুটে আসেন। রিপাবলিকান পার্টির রাজ্যনেতা এবং মতুয়া ভক্ত সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস বহু চেষ্টা করেও মতুয়া ভক্তদের এর আগে উদ্বাস্তু আন্দোলনে সামিল করতে পারেন নি। তাই তিনি এই অনশনের সময় 'উদ্বাস্তু কল্যাণ সংঘ' নামে একটা উদ্বাস্তু সংগঠন তৈরি করে ২০০৩ সনের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনের দাবি মতুয়াদের দাবির সাথে জুড়ে দিলেন। শুরু হল মিলিজুলি অনশন। প্রকৃতপক্ষে সুকৃতিবাবু এবং তার রিপাবলিকান পার্টির উদ্যোগেই এই অনশন কর্মসূচী পালিত হয়। এই অনশনেই প্রধান দাবি গুলি ছিল (ক) হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিনকে জাতীয় ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা। (খ) ঠাকুরবাড়ির বারুণীর সময় মতুয়া ভক্তদের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা (গ) ভক্তদের জন্য এইসময় ট্রেনে ফ্রি যাতায়াত ব্যবস্থা করা (ঘ) ঠাকুরবাড়ি বরাবর নতুন স্টেশন করা। (ঙ) ঠাকুরের নামে কলেজ করা ইত্যাদি। নাগরিকত্বের দাবি তাদের কাছে ছিল গৌণ এবং এই নাগরিকত্বের দাবি 'উদ্বাস্তু কল্যাণ সংঘের' ব্যানারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। এই অনশন ভঙ্গ করান রিপাবলিকান পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আবার রিপাবলিকান পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চেষ্টায় অনশনকারীরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সুতরাং এই অনশনের পেছনে ছিল সুকৃতিবাবুর চেষ্ট এবং রিপাবলিকান পার্টির সদিচ্ছা। এরপরের ঘটনা ২৮ শে ডিসেম্বর ২০১০, মহাধুমধাম করে ধর্মতলায় উদ্বাস্তু সমাবেশ। লক্ষাধিক লোকের সমাগম। ২০০৪ সনে মিলিজুলি অনশনের পর আর উদ্বাস্তু সমস্যার কথা তাদের মনে নেই। ৬ বছর পর টাস্ক ফোর্সের নির্দেশ পত্রিকায় দেখা মাত্র উদ্বাস্তু আন্দোলনের কথা মাথায় এসেছে। তবে সে আন্দোলন কিন্তু উদ্বাস্তু আন্দোলন ছিল না, ছিল ঠাকুরবাড়ির গণভিত্তির প্রদর্শন।

২১ শে নভেম্বর,২০১০ সন, ঠাকুরনগরে মতুয়া মহাসংঘের ২৪তম বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে। এই অধিবেশন সফল করাই ছিল সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সহস্রাধিক প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদান করেন। এই

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলিকাতা শহিদ মিনার ময়দানে অথবা রানি রাসমণি বা মেট্রো চ্যানেলের সামনে বৃহত্ত সমাবেশ করবো। সমস্ত মতুয়া ভক্তদের সেখানে জমায়েত হতে মতুয়া মহাসংঘ আহ্বান জানাবে"—

ইতি,
বীনাপানি ঠাকুর
শ্রীকপিলকৃষ্ণ ঠাকুর
তাং- ২১/১১/২০১০ মতুয়াধাম, ঠাকুরনগর।

সুতরাং দেখা যায় ব্যক্তি সমস্যার বাইরে বীনাপাণিদেবীও ধর্মীয় গণ্ডীর উর্দ্ধে উঠতে পারেন নি। বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে মতুয়ারা একটা বড় শক্তি। সেকারণে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের মতুয়াদের কাছে প্রত্যাশাও অনেক বেশী, তাই উদ্বাস্তুদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি না করে উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আন্দোলন করলে মতুয়া ধর্ম আরও বেশী মহিমান্বিত হত। শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর বেঁচে থাকলে আজ হয়তো এমনটা হতো না। তিনি ছিলেন সকল নিপীড়িত মানুষের আত্মজন। জীবে কর্তব্য ও নিষ্ঠা, এটাই ছিল তার মূল মন্ত্র। স্মরণ রাখা ভাল যে, কেনুয়াডাঙার বিপিন গোসাঁইয়ের বাড়িতে বসে গুরুচাঁদঠাকুর যে বিশ্ব মানব প্রেমের বাণী শুনিয়েছিলেন, খুব সবিনয় মতুয়া মহাসংঘের কাছে সেই আদর্শ কামনা করি এবং ভবিষ্যতে সবাইকে নিয়ে তারা উদ্বাস্তু আন্দোলনে নেতৃত্ব দিন। স্মরণ রাখবেন, না চাইলেও সকল উদ্বাস্তু সংগঠনগুলো এই সমাবেশে সহযোগিতা করেছে। যেভাবেই হোক ২৮/১২/২০১০ তারিখের উদ্বাস্তু সমাবেশ উদ্বাস্তুদের জয় হয়েছে। এই জন্য আমাদের তরফে মতুয়া মহাসংঘকে ধন্যবাদ। বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক দল এক মঞ্চে উপস্থিত হয়ে উদ্বাস্তুদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে, এই সব কৃতিত্ব মতুয়া মহাসংঘের। একটি কথা চিরসত্য "ভাবনার মোহমুক্তি ঘটাতে হলে বিজ্ঞানচর্চা দরকার"। তখন নেতারা সব ভোটের জন্য আসেন নি তো?

## আঠেরো

## উদ্বাস্তু আন্দোলন ব্যর্থতার কারণ

রাকা বধের হেতু একটা নয়, অনেক। বামফ্রন্ট সরকারের পতনের কারণও অনেক। তদ্রূপ উদ্বাস্তু আন্দোলনের ব্যর্থতার পিছনে অনেক কারণ আছে। প্রথমত: উদ্বাস্তু আন্দোলনের ইতিহাস খুঁজলেই তার ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত: উদ্বাস্তুদের সংকীর্ণ চরিত্রই উদ্বাস্তু আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। তৃতীয়ত: এরা পাঞ্জাবী নয়, বাঙালি। চতুর্থত: এরা প্রায় ৮৫ শতাংশ নিম্নবর্গের মানুষ। আন্দোলন মানেই বাঁচার লড়াই, অধিকারের লড়াই। প্রকৃত লড়াই আন্দোলন বলতে যা বুঝায়, তা করার কোনো গুণই এদের মধ্যে নেই। বিশেষ করে বাংলার ষড়ঋতুর জলবায়ু, সু-স্নিগ্ধ আবহাওয়া, অফুরন্ত নদ-নদী, সবুজ বন, পলিযুক্ত মাটি, অল্প আয়াসে খাদ্য, প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থা

বাংলার মানুষকে কবি, ভাবুক, উদাসীন, আত্ম[illegible], স্থবির, অলস, আত্ম[illegible], অনৈক্য, মিথ্যাবাদী, ভীরু, পলায়নপর ইত্যাদি গুণে ভূষিত করে রেখেছে। তাই কবিগুরু দুঃখ করে বলেছেন—

৭ কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করোনি ।

তবে দুই একজন কালজয়ী পুরুষের আবির্ভাব যে ঘটেনি তা নয়, কিন্তু উপরোক্ত ভৌগলিক পরিবেশের মানুষ সাধারণতঃ ঐ চরিত্রেরই হয়। তাই সামগ্রিকভাবে বাঙালি জাতি লড়াকু জাতি নয়। যে কয়জন কালজয়ী পুরুষ স্বাধীনতার জনয লড়াই করেছেন, তার চেয়ে দশগুণ বেশি ছিল বিশ্বাসঘাতক। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, ১৯৪৭ সনে ধর্মীয় গোঁড়ামির কাছে বঙ্গীয় জাতীয় সত্তা পরাজিত হয়েছে। বাঙালির লড়াইয়ের ধার সেদিন প্রমাণিত হয়েছে। বাঙালিরা সেদিন ভাগ হয়ে গেল, ধর্মীয় অস্তিত্বে। বাঙালির অনৈক্য প্রমাণিত হল। সে সময় ১.২০ কোটি লোক সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে বাংলাভাগের বলি হল। সাম্প্রদায়িক অত্যাচারে ওপার বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এপার বাংলায় চলে এল। আরও মজার এই যে, যারা বাংলাভাগের বলি হল, তারাও এক পংক্তিতে ছিলনা। সেখানেও শ্রেণীভেদ। তাদের মধ্যে উচ্চবর্ণের লোক, তারা আগেই চলে এসেছে এবং তারা ভারতে এসে সার্বিক পুনর্বাসনও পেয়েছে। যারা নিম্নবর্ণের লোক, তারা একসাথে এলো না, তারা পরে এলো। যার ঘাড়ে যখন লাঠি পড়ে সে তখন পালিয়ে আসে, অন্যেরা দাঁড়িয়ে কৌতুক দেখে। এভাবে ৫/৬ বছরের মধ্যে ৩০লক্ষ লোক ভারতে এসে গেল। ১৯৫৫ সনে আরম্ভ হল উদ্বাস্তু আন্দোলন। সংগঠনের নাম —'সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ', সংক্ষেপে ইউ. সি. আর. সি. এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল উচ্চবর্ণের লোক এবং যারা সব বামপন্থী বলে পরিচিত। যাদের ওপার বাংলার থেকে আসা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিষেধ ছিল। কিন্তু মুসলিম অত্যাচারে তা আর সম্ভব হয় নি। অপরদিকে, যাদের জন্য এই উদ্বাস্তু আন্দোলন, তারা নেতৃত্বে ছিল না, তাদের আন্দোলন যতটা উদ্বাস্তুদের স্বার্থে ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল কংগ্রেসকে নাজেহাল করা। সে কাজে যখন তারা সফল হল এবং ক্ষমতার গন্ধ টের পেল তখন থেকে উদ্বাস্তু আন্দোলন সীমিত হতে শুরু করল। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক ছিল, শিক্ষিত লোকও ছিল। ১৯৭৭ সনে যখন তারা পুরোপুরি ক্ষমতায় এলেন তখনই উদ্বাস্তু আন্দোলন বন্ধ হল, এমনকি ১৯৭৮ সনে মরিচঝাপী দ্বীপে উদ্বাস্তুদের উপর অত্যাচার শুরু হল। এভাবে আমাদের আন্দোলন ব্যর্থ হল। ফলে আজ [illegible] সমগ্র ভারতে ৪০/৪৫ লক্ষ বাঙালী উদ্বাস্তু এখনও সেখানে অমানবিক জীবনযাপন করতে লাগল। সুতরাং এভাবে ১৯৭০ সন পর্যন্ত আগত উদ্বাস্তুদের আন্দোলন ব্যর্থ প্রমাণিত হল।

কোনও আন্দোলন সফল করতে হলে তার জন্য আন্দোলনকারীদের সুনির্দিষ্ট কিছু গুণ থাকা চাই যেমন— সুনির্দিষ্ট দর্শন, সততা, ত্যাগ, একতা, বাস্তববোধ, দূরদর্শিতা

অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। আগের নেতৃত্বের কিছু গুণ ছিল তাই সামান্য সফল হয়েছে, আবার অনেক গুণ ছিল না, তাই ব্যর্থও হয়েছে।

১৯৭১ সনের পরে বাংলাদেশ থেকে যেসকল উদ্বাস্তু এসেছে তাদের উপরোক্ত একটি গুণও নেই, অথচ কিছু নির্গুণ আছে। যেমন, এরা প্রচণ্ড ব্যক্তি স্বার্থে ব্যস্ত, আন্দোলন করার আগে নিজের স্বার্থ খোঁজ করে। আবার রাজনৈতিক দল যখন চাঁদা চায়, তখন চাঁদা দেয় এবং তাদের সাথে মিছিলেও যায়, অথচ উদ্বাস্তু আন্দোলনে এক টাকাও চাঁদা দেবে না এবং মিছিলেও যাবে না। আবার দালালিতে ৫০০ টাকা দিয়ে রেশন কার্ড করাবে, হাজার হাজার টাকা দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলাবে, কোনো কিছু বুঝাতে গেলে আগেই বুঝে গেছে, তাই বোঝানো যায় না। ছেলেমেয়েদের স্কুল পাঠশালায় পাঠাবে না। বয়স্করা তাস খেলা এবং ধর্ম নিয়ে মত্ত থাকবে, অধিকাংশ লোকের অক্ষর জ্ঞান নেই। লেখাপড়াও শিখবে না। যাদের জন্য আন্দোলন, তাদের চরিত্র এই, সুতরাং আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অপরদিকে যে সকল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক এসেছে, তাদের চরিত্র আরও ভয়াবহ। এরা বড়বড় কথা বলবে, কিন্তু ছোট কাজটিও করবে না। তারা অনেক গুণে গুণান্বিত, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিপত্তি ঘটে। [illegible] কিন্তু নাগরিক অধিকার সম্পর্কে জানে না। বড় বড় [illegible] নিজে কিছু দান করবে না। বেশ কিছু লোক চাকরি করে, [illegible] ব্যবসা করে, তাদের নাগরিকত্ব নেই, অথচ নাগরিক আন্দোলনের জন্য কিছু দান করবেনা। অনেকে কৌশলে ভোটাধিকার পেয়েছে, তাই নিজেকে নাগরিক বলে মনে করে, বোকামি এখানেই। পুলিশকে ২৫০০০ টাকা ঘুষ দেবে, উদ্বাস্তু আন্দোলনে ৫০ টাকা দেবে না। শিক্ষিত হলেও এরা খুব নিচু মনের, এই সমস্ত কারণে উদ্বাস্তু আন্দোলন ব্যর্থ।

এরপরে আসে উদ্বাস্তু নেতৃত্ব এবং সংগঠনগুলির দুর্বলতার কথা। ১৯৭১ সনের পরে যেসকল উদ্বাস্তু বাংলাদেশ থেকে এসেছে তারা খুবই ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। সমাজবোধ এবং দেশাত্মবোধ বলতে এদের কিছুই নেই। শুধু তাই নয়, এদের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্বের খুব অভাব। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যে গুণগুলির কথা বলা হয়েছে সেই গুণগুলির একটা গুণও এদের নেই। আছে কিছু অশুভ গুণ—যেমন — নেতা হবার লোভ, ছোটখাট সংগঠন করা এবং সংগঠন ভাঙা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। নিজের কোনো যোগ্যতা নেই, অথচ অন্যের ভুল ত্রুটি খুঁজে বার করা। এছাড়া বিষয়ভিত্তিক নিজস্ব কোনো দর্শন নেই, একসুরে বক্তব্য নেই, অভিজ্ঞতা নেই এবং আর্থিক সহযোগিতার সদিচ্ছা নেই। এই সমস্ত কারণে উদ্বাস্তু আন্দোলনের অগ্রগতি হয় না। স্মরণ রাখতে হবে, (ক) যে আদর্শে একটা সংগঠন গড়ে উঠে, সেই একই আদর্শে আর একটা সংগঠন তৈরি করার নাম হল বিভেদ। (খ) নেতৃত্বের লোভে আর একটা সংগঠন সৃষ্টি করার নাম হল বিরোধিতা। (গ) নিজস্ব কিছু লোক আছে বলে আর একটা সংগঠন তৈরি করার নাম হল বৈরিতা। (ঘ) নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সংগঠনের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার নাম হল বিচ্ছিন্নতা। (ঙ)

নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সর্বহারাদের স্বার্থের ব্যাঘাত সৃষ্টি করার নাম হল বিশ্বাসঘাতকতা। বহু সংগঠন এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে এজন্যই সংগঠন গুলোর কোন দর্শন নেই। এছাড়া আর একটা বিশেষ ত্রুটি হল তফশিলী আন্দোলন এবং উদ্বাস্তু আন্দোলন এরা মিলিয়ে ফেলে, কোন কোন সংগঠন আবার ধর্মীয় আন্দোলনের সাথে উদ্বাস্তু আন্দোলন মিলিয়ে ফেলে। হতে পারে অধিকাংশ উদ্বাস্তু তফশিলী, কিন্তু উদ্বাস্তুদের মধ্যে সম্প্রদায়গত কোন বিরোধ থাকা একান্তই উচিত নয়। কোথাও কোথাও এই দৃষ্টিভঙ্গী আছে বলেই উদ্বাস্তু আন্দোলন ব্যর্থ হয়। সকল উদ্বাস্তু এক এবং অভিন্ন হওয়া উচিত। তাদের একটাই পরিচয়, তারা সব '<u>ভারত ভাগের বলি</u>'।

সর্বশেষে, পশ্চিমবাংলার সাংসদগণ যত সময় এই আন্দোলনকে সমর্থন না করবে ততক্ষণ এই আন্দোলন সফলতা লাভ করবে না। বিভিন্ন উদ্বাস্তু সংগঠনের বাস্তবতা এবং দূরদর্শিতার অভাব বলেই এই চেষ্টা করা হয় না। শুধু কিছু নেতা একত্র হলে আন্দোলন হয় না। মমতার মতন সাধারণ মানুষের মধ্যে সবসময় ঘুরতে হয় এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। লাগাতার আন্দোলন না হলে সংগ্রাম সফল হবে না। <u>আন্দোলন এবং সঠিক কর্মসূচীই সাফল্যের চাবিকাঠি।</u>

## উনিশ

## উদ্বাস্তু আন্দোলনের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী যা যা হওয়া উচিত

১. যেহেতু বাংলাদেশী উদ্বাস্তুরা ভারতীয় নাগরিক হতে চাইছে, সেকারণে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে উদ্বাস্তু আন্দোলন হওয়া উচিত।

২. উদ্বাস্তুদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে, এখন স্বাধীনতার প্রথম দশক নয়, যেকারণে ভারতবাসী এবং ভারতসরকার তাদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল হতে বাধ্য। বরং পশ্চিমবাংলার বহু মানুষ তাদের বিরুদ্ধে, অধিকন্তু অনুপ্রবেশকারী হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি কেস করা আছে এবং কোর্ট উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে মত দিয়েছে। সুতরাং উদ্বাস্তুদের কর্তব্য হল, পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন আদায় করা, সাথে সাথে স্থানীয় বাসিন্দাদের সুখ দুঃখের সাথী হওয়া এবং তাদের বন্ধু হওয়া।

৩. উদ্বাস্তুদের বুঝতে হবে, ১৯৪৭ সনে বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে স্বাধীন হয়েছে এবং এখন ৬২ বছর অতিক্রান্ত, তাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষকে খুব সতর্ক হয়ে প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়। অপর দিকে ভারতের মধ্যে বাইরে সন্ত্রাস, ৪০ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে, তার মধ্যে আকাশ ছোঁয়া দুর্নীতি, ধর্মীয় এবং সামাজিক বিভেদ তার উপর অনুপ্রবেশের সমস্যাসহ কাশ্মীর সমস্যার

মত ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা কতদূর সমাধান করা সম্ভব খুব বিচক্ষণতার সাথে তা ভাবতে হবে। অনন্তকাল ধরে যে যখনি এখানে আসবে তখনি তার দাবি মেনে নিতে হবে, এটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না। চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি, রাজনীতিতে সবসময় রক্ষা করা যায় না। সেক্ষেত্রে জনগণের মতামতই বেশী প্রাধান্য পায়। এটাই বাস্তব সত্য।

৪. উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশকারী এই দুটি পৃথক কথা, পৃথক সত্ত্বা, পৃথক ভাব, পৃথক সংজ্ঞা, পৃথক পরিচয়, পৃথক সম্পর্ক, সুতরাং ভারতীয় জনগণ এবং ভারত সরকারের কাছে এই দুটি সম্প্রদায়কে পৃথক করে চিহ্নিত করাতে হবে। ভারত সরকারকে বোঝাতে হবে এর প্রথমটি দেশপ্রেমিক শক্তি এবং দ্বিতীয়টি দেশবিরোধী শক্তি। কারণ মূল সমস্যার এখানেই স্থিতি।

৫. স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশভাগের বলি প্রাপ্ত মানুষের উদ্দেশ্যে জাতীয় নেতাদের প্রতিশ্রুতিগুলি স্বাধীনতার ঐতিহাসিক মহান দলিল এবং স্বাধীনতার অসমাপ্ত কাজ, একথা সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বারে বারে স্মরণ করে দিতে হবে।

৬. নিজেদের দোষত্রুটিগুলি সংশোধন করতে হবে। যেমন— বিভেদ, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, ধর্মীয় উম্মাদনা, অসহযোগিতা ইত্যাদি। স্মরণ রাখতে হবে, আমরা যা যা দাবি করব সরকার তা সবই মেনে নিতে বাধ্য, তা কিন্তু মোটেই নয়।

৭. উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবি করতে গিয়ে জাতপাতের রাজনীতি করা মোটেই সমীচিন নয়, কারণ বাংলার জাতপাতের সৃষ্টিতে অনেক বৈষম্য আছে, তাই এই তত্ত্ব বাংলায় অচল।

৮. ভারত সরকার কাকে বা কাদের নাগরিকত্ব দেবে বা না দেবে অথবা কার নাগরিকত্ব কেড়ে নেবে সেটা সরকারের সম্পূর্ণ এক্তিয়ার। উদ্বাস্তুদের এবিষয়ে বলার অধিকার নেই, যেহেতু তারা ভারতের নাগরিক নন। তবে অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব দিলে দেশের কতটা ক্ষতি হতে পারে তা একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে দেশবাসীকে সতর্ক করে দেওয়া যেতে পারে।

৯. উদ্বাস্তু সমস্যা বাঙালী জাতির প্রথম সমস্যা, সাথে সাথে জাতীয় সমস্যাও বটে। তাই জাতীয় সমস্যা হিসেবে এটাকে জাতির কাছে তুলে ধরতে হবে এবং বড় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

১০. হোমল্যান্ড আন্দোলন এবং উদ্বাস্তু আন্দোলন সম্পূর্ণ বিরোধী আন্দোলন। দুই বাংলার বিভাজন আর নয়।

১১. ওপার বাংলার উদ্যোগেও একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা উচিত। যেমন : বাংলাদেশের চার মূলনীতি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অথবা, নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির মতন আর একটা চুক্তি করতে হবে। অথবা, দুই বাংলার সংখ্যালঘু বিনিময় করতে হবে। যেহেতু উদ্বাস্তু সৃষ্টির উৎসে মূলেই একটি স্থায়ী প্রতিকার চাই।

## কুড়ি

### সমাধান সূত্র

উক্ত সমীক্ষা এবং যুক্তিগুলি অবতারণার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য যে যে বিষয়গুলির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে সেগুলি নিম্নে প্রদত্ত হল—

১. একটি সুনির্দিষ্ট এবং প্রগতিশীল দর্শনের ভিত্তিতে একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

২. জাতীয় নেতাদের প্রতিশ্রুতিগুলি সংগ্রামের হাতিয়ার করতে হবে এবং জাতীয় স্তরে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন আছে কিনা তা নিয়ে ভাবতে হবে।

৩. দেশভাগের শর্তাবলী এবং আনুপাতিক হার তুলে ধরতে হবে। বাংলাদেশ থেকে আরও উদ্বাস্তু আসুক এমন কোনও প্ররোচনা দেওয়া চলবে না।

৪. বিশ্ব মানবাধিকারের বক্তব্য এবং UNHCR এর দেওয়া নীতিগুলির উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৫. উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশকারী এক নয় তা যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।

৬. উদ্বাস্তুরা দেশপ্রেমিক নাগরিক, সৃজনশীল শক্তি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির উৎস, তা প্রমাণ করতে হবে।

৭. বাংলাদেশ সৃষ্টি উদ্বাস্তুদের জন্য কোনো বাধা হতে পারে না তা প্রমাণ করতে হবে যুক্তি দিয়ে।

৮. পশ্চিমবাংলার মূল বাসিন্দাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে।

৯. উদ্বাস্তু সমস্যা স্বাধীনতার অসমাপ্ত কাজ তা রাজনৈতিক দলগুলোকে বুঝতে হবে।

১০. অভিজ্ঞ একজনের নেতৃত্বের অধীনে যুক্তি সংগত কর্মসূচীর ভিত্তিতে লাগাতার আন্দোলন করতে হবে যাতে বাংলার সাংসদরা দিল্লীর সংসদে সোচ্চার হন।

১১. ছোটো ছোটো উদ্বাস্তু সংগঠন এবং সামাজিক সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

১২. অবিলম্বে জেলাভিত্তিক তালিকা তৈরি করতে হবে।

১৩. একটি নির্দিষ্ট তহবিল গড়তে হবে।

১৪. অঞ্চলে অঞ্চলে ওয়ার্কশপ করতে হবে।

১৫. কেন্দ্র ও রাজ্যভিত্তিক অফিস করতে হবে।

১৬. আন্দোলন বাংলাকে ভিত্তি করে দিল্লীমুখী করতে হবে।

# বাবা সাহেবের দু'টি কথা

দেশ বিভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বাবা সাহেব বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। তাই তখন যারা দেশ ভাগের বলি হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন —

*"যে সব তফশীলি মানুষ পাকিস্তানে আটকে পড়েছেন, আমি তাদের বলতে চাই, তারা যেভাবেই পারেন, পাকিস্তান থেকে যেন ভারতে চলে আসেন।"* আর দ্বিতীয় যে কথাটি বলতে চাই, তা হ'ল এই, *"পাকিস্তানে হোক, আর হায়দ্রাবাদে হোক, মুসলমানদের প্রতি বা মুসলিম লীগের প্রতি আস্থা প্রদান করলে সেটা হবে তাদের পক্ষে মৃত্যুর সমতুল্য। হিন্দুদের তারা অপছন্দ করেন বলে মুসলমানদের বন্ধু হিসাবে দেখা তফশীলি মানুষদের একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের এই চিন্তা ভুল।"*

সূত্র —

ডঃ আম্বেদকর জীবন ও ব্রত
এক বিংশ অধ্যায়
ধনঞ্জয় কীর